প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৭০



প্রকাশনায়ঃ হামিদুল ইসলাম, বিউটি বুক হাউস
৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা ১। মুদ্রণেঃ [illegible]ডি. এম.
খান, দি ক্রাউন প্রেস, ২ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১।

পূজ্যপাদ

আচার্য শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

করকমলেষু—

সূচীপত্র

কাব্যপাঠ—

গ্রন্থ-সম্পাদকের নিবেদন

পূর্বসূরীদের নমস্কার। যে সকল অধ্যাপক গ্রন্থটি সম্পর্কে নিরন্তর ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন তাঁদেরকেও নমস্কার।

এই গ্রন্থ-সম্পাদনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি সস্নেহে আমাকে নির্দেশ-উপদেশ দান করেছেন, আমার অকিঞ্চিৎকর রচনার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিয়ে বিদগ্ধজনের কাছে উপস্থাপিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেই ঋষি-কল্প অধ্যাপক, আমার পরম পূজ্য আচার্য ডাঃ ক্ষুদিরাম দাস, এম. এ. ডি. লিট্ মহাশয়কে আমার সশ্রদ্ধ ও ভক্তিনত প্রণাম নিবেদন করছি।

বাঙলা সাহিত্যের যে গ্রন্থগুলো ক্লাসিক-গ্রন্থ বলে বিবেচিত, সেগুলো সম্পাদনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। নিজের জ্ঞানের দীনতা ও শক্তির স্বল্পতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবহিত—এ বিষয়ে আমার আন্তরিক নিষ্ঠা এবং আমার আচার্যগণের শুভ আশীর্বাদ পাথেয় স্বরূপ। এই প্রচেষ্টার প্রথম ফল 'বীরাঙ্গনা কাব্য।' এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থটির রস-রূপ প্রকাশনে কতদূর সাফল্য লাভ করেছি তা সুধীজনের বিচার্য। বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে গেছে যার জন্যে আমি লজ্জিত; সাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গের সহৃদয়তার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গ্রন্থটির উৎকর্ষ-বিধান সম্পর্কে অধ্যাপক ও সাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গের মতামত প্রার্থনা করছি।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় গ্রন্থটির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেছেন। শ্রীযুত বিমলকুমার ধর যত্নের সঙ্গে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শ্রাবণ, ১৩৭০ — অমরেন্দ্র গণাই

পরিচায়িকা

ডাঃ শ্রীক্ষুদিরাম দাস, এম. এ ডি-লিট্

আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যের উদ্ভবকালে 'বীরাঙ্গনা'র মত উপাদেয় খণ্ডকাব্য সমষ্টির যোজনা এর ভাবী শুভ সূচিত করেছিল।

মেঘনাদবধ বাঙ্‌লা কাব্যধারায় একক সৃষ্টি। এ কাব্যের রীতি এবং প্রকৃতি এর পরবর্তী কাব্যপ্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। উদাত্ত, মধুর এবং করুণের বিমিশ্র নির্মাণ, বর্ণনাবৈচিত্র্যে অপরিচিত বিস্ময়ের পুনঃ পুনঃ উদ্দীপন, সমুন্নত মানবীয় ভাবরাজির আলোড়ন প্রভৃতি গুণ ও ধর্ম নিয়ে এ-কাব্য আমাদের অজস্র কুসুমসমারোহের একপাশে বনস্পতির মত দাঁড়িয়ে আছে। প্রবল গুণদোষের সমবায়ে উৎপন্ন এবং প্রবলতর ব্যক্তিত্বে চিহ্নিত এ-কাব্য পরবর্তী কবিদের অনুকরণ-অনুশীলনের ঊর্ধে থেকে গেছে বললেই চলে। আবার, অন্যদিকে ঘটনাবৈচিত্র্যহীন একান্ত তরল প্রণয়ভাবুকতা এবং মাত্রাসম মিলযুক্ত পদ্ধতির রচনা মধুসূদনের কবিস্বভাবের অনুকূল ছিল না বলে তাঁর খেলাচ্ছলে রচিত ব্রজাঙ্গনা কাব্য নিষ্ফল হয়েছে। 'বীরাঙ্গনা' এই দু'কোটির আতিশয্য থেকে মুক্ত খুব স্বাভাবিক রচনা। অথচ 'বীরাঙ্গনা'য় কবির মৌলিকতা প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। মেঘনাদবধে রাবণের চরিত্র নির্মাণে বাঙ্‌লা রামায়ণ তাঁকে পথ দেখিয়েছিল এমন কথা উচ্চারিত হওয়া অযৌক্তিক নয়, কিন্তু বীরাঙ্গনা? প্রাচীন পুরাণ, যেখানে কাব্যের ইঙ্গিত মাত্র নাই এবং প্রাচীন কাব্য, যেখানে ঘটনা বা বস্তুর ছন্দোবদ্ধ বিবৃতিই লক্ষণীয়—তাকে স্পর্শ করে কাব্যরসে সমুত্তীর্ণ করে দেওয়া প্রথমশ্রেণীর কল্পনাকুশলতা ও নির্মাণ শক্তিরই নিদর্শন। অনুরূপ গ্রীক্ কাব্য তাঁকে এই ধরণের নির্মাণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে উদ্দীপিত করেছিল মাত্র। এর চরিত্র ও ভাব, বর্ণনরীতি এবং স্বচ্ছন্দ কল্পনাবিহার দত্তকুলোদ্ভব কবি-বিদ্রোহীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

আমাদের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিল। নারী কেবল যৌন-জীবনের সঙ্গিনী অথবা নরকের দ্বার রূপে পরিগণিত হইল না, তাহারও স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত হইল। নারীদেহ তখন আর ভোগের উপকরণ রূপে নহে, সৌন্দর্যের আশ্রয়-রূপে পরিগৃহীত হইল। স্থূল জৈব ক্ষুধা তাই সৌন্দর্যসুধায় রূপান্তরিত হইল।

যে কোন পুরুষকে বরণ করা নারীর পক্ষে আর সম্ভব হইল না। তাহারও মন বলিয়া একটা পদার্থ আছে, তাহারও স্বপ্ন-কল্পনা আছে, তাহারও ভালবাসিবার পূর্ণ অধিকার আছে। পরিবার যাহাকে খুশী ইচ্ছামত অর্পণ করিবে আর নারী তাহাকেই স্বামীদেবতা বলিয়া নির্বিচারে গ্রহণ করিবে—ইহা হৃদয়হীনতা ছাড়া আর কিছু নহে। এই মিথ্যা, অর্থহীন আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। সেক্সপীয়রের Hermia তাই পিতার মনোনীত পাত্রকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল—

I would my father looked but with my eyes.
[Midsummer Night's Dream, Act I, Sc. (1)]

মধ্যযুগীয় বিশ্বাসে নারীর আত্মা পর্যন্ত অস্বীকৃত হইয়াছিল। নব-জাগৃতির উন্মেষ-লগ্নে আত্মাই শুধু স্বীকৃতি পায় নাই, নারীর ব্যক্তিত্বও স্বীকৃতি পাইল। নারীর ব্যক্তিত্বের এই জাগরণ ঘটিল একনিষ্ঠ প্রেমের মাধ্যমে।

It is the East, and Juliet is the Sun
... ...
It is my Lady, O it is my Love
... ...
The brightness of her cheek would
shame those stars,
As daylight doth a lamp................
See how she leans her cheek upon her hand :

O that I were a glove upon that hand,
That I might touch that cheek.

[Romeo & Juliet, II (ii)]

এই নারীই হইল সৌন্দর্যের সারভূতা বিগ্রহ। Beauty cult এই রেনেসাঁসেরই দান।

প্রতীচ্যের এই নবমানবতাবাদের মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীর নব্য-বাঙ্লার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সেই প্রাণগঙ্গার উৎসমুখ। মধুসূদনের কাব্য তাহারই সাহিত্যিক-প্রতিমা। সে যুগের আকাশে-বাতাসে যে মানবতাদের নীহারিকা প্রচ্ছন্ন ছিল মধুসূদনের কাব্যে তাহাই স্থির নক্ষত্রের দীপ্তিতে সংহত।

মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাই এ যুগের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাই বিভিন্ন ঘটনায় বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ফসল মধুসূদনের কাব্য। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এ মানুষ মরমী—সহজিয়া কবি চণ্ডীদাসের মনের মানুষ মাত্র; মানব-সাধারণ নহে। "তুলিব দেবতা করি মানবেরে মোর ছন্দেগানে"— ইহা আদর্শান্বিত ভাবস্বপ্ন মাত্র, আশা-আকাঙ্ক্ষা-মুখর মানবের কথা নহে। মনুষ্যত্বের গৌরবে, পুরুষকারের গৌরবে দীপ্যমান মানুষের প্রথম আবির্ভাব মধুসূদনের কাব্যে। তাই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ভাব-গঙ্গার ত্রিবেণীতীর্থ মধুসূদনের কাব্যমালা।

সতীদাহ প্রথা নিবারণের মূলে রামমোহনের কেবল সংস্কার মুক্তিই নয়, বিশিষ্ট জীবনচেতনার প্রকাশ। বিধবাবিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরের আমরণ সংগ্রাম আরও গভীরতর হৃদয়বোধকে প্রকাশ করে। রাম-মোহন যাহা মনীষার দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর তাহাই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন। এই উপলব্ধির পূর্ণতা মধুসূদনে—মনীষা ও হৃদয়ের সম্মিলনে। তাই মধুসূদনকে বুঝিতে গেলে সেই যুগের

যুগচিত্তের আকৃতি অনুভব করিতে হইবে। অথবা মধুসূদনের কাব্যে ভাল করিয়া কান পাতিলে যুগচিত্তের সমস্ত আকৃতি ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

যেহেতু বীরাঙ্গনা কাব্য আমাদের আলোচ্য, সেইহেতু নারী সম্পর্কে মধুসূদনের ধ্যান ধারণাটি উপলব্ধি করিতে হইবে, নতুবা তাহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইবে না।

(২)

নারী সম্পর্কে মধুসূদনের ধ্যান-ধারণা উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার ব্যক্তিজীবন ও পরিবার জীবনের কয়েকটি ঘটনা স্মরণ রাখা দরকার। হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মধুসূদন স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে যে নিবন্ধ রচনা করেন, তাহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব চিন্তা ও ভাবনার ছায়াপাত ঘটিয়াছে—

In a country like India, where the nurseship (if I may so call the office of a nurse) generally devolves on the mother, the importance of educating the females (the sources from which man gathers the first rudiments of knowledge) is very great, for unless they are enlightened, they spread infection of their ignorance in the minds of those they bring up. Extensive dissemination of knowledge amongst woman is the surest way that leads a nation to civilization and refinement, for it is *woman who first gives ideas to the future philosopher and the would-be-poet.*

ইহা কেবল অধীত বিদ্যার প্রকাশ মাত্র নহে, আপন অন্তর জীবনের ইতিহাস ইহার মধ্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃতির

শেষ-অংশের মধ্যে মধুসূদন কি জননী জাহ্নবী দেবীকে স্মরণ করেন নাই ?

উপরোক্ত প্রবন্ধের শেষাংশে প্রাচ্যদেশে নারী জাতির প্রতি যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় সেদিকে তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়াছেন। এই নিবন্ধের মধ্যেই নারী সম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট ধারণা ও চিন্তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মধুসূদনের জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মধুসূদনের পিতা কোনও সম্ভ্রান্ত জমিদার কন্যার সহিত মধুসূদনের বিবাহ স্থির করেন। এই পাত্রী পিতার মনোনীতা হইলেও, মধুসূদনের মনোনীতা ছিল না। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও মধুসূদনের পক্ষে দুঃসহ। মধুসূদন এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বাবা এক কালা পাহাড়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না"। সেই মহিলার কুলগৌরব বা রূপ-সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনিয়াও তাঁহার মতের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। যাহার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় বা পূর্বরাগ, অনুরাগ সম্পন্ন হয় নাই, তাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মধুসূদনের জীবনের এই ঘটনাটি কি সেক্সপীয়রের Hermiaর অনুরূপ নহে ?

মধুসূদনের চরিত্রের মৌল স্বরূপ, প্রধানতঃ প্রেম সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবনের পক্ষে মধুসূদনের আজন্ম সুহৃদ গৌরদাস বসাকের উক্তি স্মরণীয়—

His heart always brimmed over with love. His love was like the impetuous torrent that bounds over field and dale irresistible in its course, and deep in its volume, carrying on its bosom the sympathetic and

sentimental and repelling to a distance the prosaic and the callous, who could not appreciate such love. There was no ebb-tide in his feelings ; they were in perennial flood, without ever being sluggish. He was an ardent admirer of beauty, nor was beauty, less prone to reciprocate his feelings. Modhu had great faith in love at first sight.

"Who loved that did not love at first sight." Though he entertained this belief, though he was by nature impulsive, though 'no sooner thought than done,' was his motto, though inspired by love at first sight, he would not, supposing adult marriage to have been prevalent in Hindu Society, have acted with any precipitancy in the selection of a fit partner for his life. When his heart had been fixed and it would not have been fixed until he found that his better-half breathed equally responsive vows, he would, if circumstance had permitted, not have cared for the barriers of conventionalism or the trammels of caste......He could not realize the idea of a wife without experiencing before marriage the mutual 'flow of soul and feast of reason" that characterizes true love between the sexes. Mere animal passion had no influence on his feelings in matters matrimonial. He longed for courtship though courtship was a myth in Hindu life. His emotions were not excited by the mere sight

of physical beauty, without mutual play and interchange of feelings and sentiments in which grown up young people can indulge. The infantile face gave rise in his mind to fraternal sensations such as a grown up brother feels for his little sister.

আজন্মসুহৃদ গৌরদাসের উক্তি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ছায়াতলে মধুমানস গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাই সে মানসে যেমন সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল অবারিত। এই চেতনাই মহাকবির কাব্যে প্রতিফলিত—পরবর্তী অধ্যায়ে তাহা আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিব।

পুরুষের বহুবল্লভতাকে তিনি কোনদিনই স্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহার প্রতি তাঁহার যথার্থ অশ্রদ্ধা ছিল। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ স্বয়ং জাহ্নবী দেবীর জীবিতাবস্থায় পর পর তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। এজন্য পিতাকে তিনি কোনদিন ক্ষমা করিতে পারেন নাই। নারীর পক্ষে ইহা চূড়ান্ত অসম্মানজনক, পরম বেদনাদায়ক। মাতার এই বেদনা মধুসূদন অনুভব করিয়াছিলেন। এক বেদনাহত নারীমূর্তি বার বার তাই তাঁহার কাব্যলোকের মর্মমূলে আসন পাতিয়াছে।

(৩)

বাঙলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক মধুসূদন। নাটকের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রথম প্রকাশ। সেই যুগের পক্ষে শর্মিষ্ঠা অসাধারণ নাটক। এই নাটকের আঙ্গিকে কি বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা আমাদের আলোচনার পর্যায়ভুক্ত নহে, এই নাটকের ভাবধর্ম বিশ্লেষণও আমাদের অভিপ্রেত নহে। শুধু মধুসূদনের প্রেম কল্পনার স্বরূপটি আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করিব। মহাভারত হইতে ইহার

কাহিনী বা আখ্যানভাগ গৃহীত হইলেও, ইহা মধুসূদনের নিজস্ব সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা মহাভারতের কাহিনী নহে, মহাভারতীয় কাহিনীর বাতাবরণে নবজাগ্রত চেতনার বাণীরূপ। দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মধ্যে নারীর নবমহিমা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। দেবযানী চরিত্রটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। শুক্রাচার্য-দুহিতা দেবযানী ঋষিকুমারী হইলেও প্রেমের বিচিত্র ব্যাকুলতা তাহার অন্তরলোকে আলোছায়ার আলিম্পন আঁকিয়া দিয়াছে। উদ্ভিন্ন-যৌবনা দেবযানী একদা কচের নিকট তাহার কুমারী হৃদয় অর্পণ করিয়াছিল। এই আত্মনিবেদন সার্থকতায় পর্যবসিত হউক বা না হউক, তাহারই আলোকে তাহার প্রেমময়ী নারী সত্তাটিকে চিনিয়া লইতে পারি। সে প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া আপন অন্তর্বেদনার নিঃসীম অন্ধকারে অশ্রু কুয়াশা রচনা করে নাই, নির্জন ব্যথার তীর্থে মিথ্যা সান্ত্বনা পাইতে চায় নাই। তাহার অপমানিত নারী সত্তা নিষ্ফল অভিমানে কচকে অভিশাপ দিয়াছে। ইহা ত গেল তাহার অতীত কাহিনী। আলোচ্য নাট্যাংশে দেবযানীর যে পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে তাহার স্বরূপ উহা হইতে পৃথক নহে। প্রেমের মধ্য দিয়াই নারী জীবনের সার্থকতা। প্রেম নারীজীবনের সামগ্রিক সত্তা। উহারই মধ্য দিয়া সে নারীত্বকে বিকশিত করিয়া তুলে। দেবযানী তাহার মনোনীত পাত্র যযাতিকে হৃদয় অর্পণ করিয়াছিল। প্রেম প্রেমাস্পদের নিকট পরিপূর্ণ প্রতিদানের প্রত্যাশী। সুতরাং দেবযানীর প্রত্যাশাও স্বাভাবিক। এই প্রত্যাশাই রেনেসাঁসের দান। কিন্তু যযাতি অপর এক নারীর সৌন্দর্যে বিমোহিত হইয়া দেবযানীর প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করিয়া দিল। যযাতি দৈত্যকন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া প্রেমের অবমাননা করিলেন। এই চেতনা একনিষ্ঠতার ধারণা হইতে উদ্ভূত। দেবযানীর তীব্র ভর্ৎসনার মধ্য দিয়া নবযুগের নারীত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে

"যাও, যাও। তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ কোর না ; আমি কি শর্মিষ্ঠা ?"

ইহা কি মহাভারতের দেবযানীর উক্তি না নবজাগ্রত নারীত্বের অভিব্যক্তি ? নামতঃ মহাভারতের চরিত্রকে গ্রহণ করিয়াও মধুসূদন নবযুগের আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমহীন স্পর্শ যে অপবিত্র একথা মধ্যযুগের কোন নায়িকা বলিতে পারে না। ইহাই নবযুগের কণ্ঠস্বর। মধুসূদনের দেবযানীর কণ্ঠস্বরই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ নারীর উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।

[নারীর উক্তি : মানসী—রবীন্দ্রনাথ]

পিতার নিকট দেবযানীর উক্তিও স্মরণীয়—

"আপনি সে নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না। আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। দৈত্যকন্যা শর্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।"

[৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক ; শর্মিষ্ঠা—মধুসূদন]

প্রেমের অপমানে নারীত্বের তীব্র আক্রোশ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমের অসম্মান স্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়। দেবযানী কেবল কপট অভিমান প্রকাশ করে নাই। পিতার নিকট নারীত্বের এই অপমানের শাস্তিবিধানের প্রার্থনা পর্যন্ত করিয়াছে। পিতা তাহাতে অস্বীকৃত হইলে দেবযানী বলিয়াছে—"তাত ! তবে আমাকে আজ্ঞা

করুন, আমি যমুনা সলিলে প্রাণত্যাগ করি। পিতা, আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করব না"।

এই স্বাতন্ত্র্যময়ী নারী মধুসূদনের নিজস্ব সৃষ্টি।

কিন্তু কেবল দেবযানীর চরিত্র দেখিলেই চলিবে না, শর্মিষ্ঠার কথাও মনে রাখিতে হইবে। প্রেম বাহিরের কোন পরিচয়েরই অপেক্ষা রাখে না। তাই শর্মিষ্ঠা দৈত্যবালা হইয়াও যযাতিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রেমের জন্য দুঃসহ ক্লেশ বরণ করিয়াছে। এই দুঃখের কষ্টিপাথরে তাহার প্রেম শুচিস্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতির বহুবল্লভ রূপ প্রকাশ করা মধুসূদনের লক্ষ্য নহে। নিজের পিতাকে পর্যন্ত যাহার জন্য তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই, সেক্ষেত্রে যযাতিকে তিনি সমর্থন করিবেন কী প্রকারে? আসলে বিবাহোত্তর প্রেমকে—যাহা শুধুমাত্র দেহচেতনাসম্ভূত নহে, দেহমন-প্রাণের একান্ত বিশ্বাসে দীপ্তিময়, তাহাকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহা কি তাঁহার নিজের জীবনেরই নিয়তিরই প্রতিচ্ছবি?

নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে ইহাই মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের ধারণা। কিন্তু তখনও তিনি অন্তরলোকের মানসীর সন্ধান পান নাই। তাঁহার দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতীর নেপথ্য সঙ্গীতে তিনি বলিয়াছেন—

কত করি ভুলিবারে মন তা তো নাহি পারে
যারে যে ভাবনা করে সে জাগে অন্তরে।

এই অন্তরে জাগ্রত মানসীকে তিনি জীবনে ও কাব্যে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। "খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।" সে পরশ পাথর কোন দিনই আয়ত্তের মধ্যে আসে না—কিন্তু এক অন্তহীন এষণা তাহাকে চালিত করে।

I sigh for Albion's distant shore
Its valleys green,—its mountains high.

সুদূর ইংলণ্ডের উপকূল বার বার তাঁহাকে ইশারায় ডাক দেয়। কিন্তু সে স্বপ্নকল্পনা কোনদিনই প্রাপ্তির মধ্যে প্রশান্তি লাভ করে না। এই সন্ধান—এই নিরুদ্দেশ যাত্রা, এই অপ্রাপ্তির বেদনা—ইহাই তো রোমান্টিক চেতনা। এই চেতনার পথ বাহিয়াই দূরে, বহুদূরে, স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে শিপ্রানদীপারে রবীন্দ্রনাথ কবিমানসীর সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। তাহার দেখা মিলিলেও, তাহাকে পান নাই—অশ্রু বিনিময়েই তাহার পরিসমাপ্তি। "অঝরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে"। মধুমানসেও সেই মানসী ছিল, যাহাকে তিনি স্বপ্নে ও কল্পনায় বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি আপন অন্তরের ভালবাসা অর্পণ করিয়াছেন, সে চিরকাল অপ্রাপ্য রহিয়াই গেল। এই অধরার জন্য তাঁহার কবিমনের বিচিত্র ব্যাকুলতা, নিবৃত্তিহীন আকাঙ্ক্ষা—

I loved a maid a blue-eyed maid
    As fair a maid can ever be, O
But she, oft with disdain, repaid
    My fondness and affection, O.
For her I sighed, and e'er shall sigh
    Tho' she shall ne'er be mine O.
For this sad heart's starless sky
    None but herself can light O.

যিনি চির-অপ্রাপ্য, অধরা তাহার জন্যই কবিচিত্তের নিবিড় উন্মুখরতা। কবির অন্তর আকাশে তিনিই ধ্রুবতারাময়ী, সৌন্দর্যের দূতী। নব নব রূপে কবি তাহাকেই সৃষ্টি করেন।

তিল তিল সৌন্দর্য দিয়াই তাহাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। পৌরাণিক তিলোত্তমার মধ্যে সেই সৌন্দর্য স্বপ্নকে একবার প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন। তাহারই ফল তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের মধ্য দিয়া মধুকবি তাঁহার সৌন্দর্য-পিপাসাকেই পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছেন। সৌন্দর্য-পিপাসা রোম্যান্টিক-চেতনা-ভিত্তিক—ইহাই রেনেসাঁসের beauty cult। রহস্য ও বিস্ময় সৌন্দর্যের মর্ম-বেদী রচনা করে, অনির্বচনীয় বিস্ময়ে জগৎ ও জীবনকে সে আবিষ্কার করে। ইহাই আত্ম আবিষ্কার—realization of the self. সরোবরের নির্মল জলে তিলোত্তমা আপনার অনুপম রূপমাধুর্যের প্রতিবিম্বন দেখিয়া পরম বিস্ময় অনুভব করিয়াছেন—

ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি ভ্রান্তিমদে মাতি
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে।

অহল্যার বিস্ময়ের ইহাই পূর্বাভাস।

তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা পানে চেয়ে কথা নাহি কয়,
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্য তীরে
চির পরিচয় মাঝে নব পরিচয়।

[অহল্যার প্রতি : মানসী—রবীন্দ্রনাথ]

কাননে ভ্রমণ করিবার সময় তিলোত্তমা আত্ম-অনুরাগের এক অপূর্ব চিত্র উপহার দিয়াছে—

কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া আহা, রাঙা পা দুখানি
থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ
মোহিত মদনমদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল

কপোতীর সহ ; কত গুণ গুণ করি
আরাধিল অলিদল, কে পারে কহিতে ?

তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করিয়া বিশ্বকর্মা যে তিলোত্তমার সৃষ্টি করিলেন সে কোন সামাজিক বন্ধনের মধ্যে অন্বিত নহে—"নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী"। যুগযুগান্তর হইতে সে সুধু বিশ্বের প্রেয়সী। তাই তাহার রূপসৌন্দর্যদ্যুতি সন্ধ্যাপ্রদীপের স্নিগ্ধ আভায় গৃহজীবনকে আলোকিত করিয়া তোলে না, কাহারও কল্যাণ কামনায় সে সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু ধারণ করে না। তাহার রূপসৌন্দর্য চিত্তজগতে রহস্যময়তার সৃষ্টি করে, অশান্ত আকাঙ্ক্ষার বহ্নিদহন জাগাইয়া তুলে। সেই বহ্নিদহনের চিত্রই তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য—মনোজগতের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার, অপরিতৃপ্তির এক বেদনা-সম্ভব রূপচিত্র, সৌন্দর্যের বেদীমূলে আত্মাহুতির করুণ কাহিনী।

ঠিক যেমনটি খুঁজিয়াছিলেন তেমনটি পান নাই। তাই রিজিয়া নাটক লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। রিজিয়া চরিত্রের তেজস্বিতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পক্ষে ঐ চরিত্র সহায়ক হইবে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। সুভদ্রাহরণ রচনার প্রেরণার মূলেও ঐ মনোভাব কাযকরী ছিল। অবশ্য তিনি এই দুইএর কোনটিই লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের ভুলিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিকথায় মধুসূদন সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

Even after his return from England in 1867, he talked to me of Rizia and Rizia only, but he did not live to write it.

চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে স্বয়ং কবিই বলিয়াছেন—

ভেবেছিনু নবতানে গাব বঙ্গাসরে
তোমায় হরণ গীত, সুভদ্রা সুন্দরী।

সেই অলিখিত কাব্যের কবি মধুসূদনকে ভুলিলে চলিবে না।

(৪)

নারীর দুই রূপ—একরূপে সে প্রেয়সী, অন্যরূপে সে শ্রেয়সী। একজন আমাদের যৌবনের স্বপ্ন-কল্পনার রাগরক্ত কিংশুক-পলাশ, অন্যজন শ্রদ্ধাভক্তির শিশির-স্নিগ্ধ সায়াহ্ন-যূথিকা।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।
[দুই নারী : বলাকা—রবীন্দ্রনাথ]

ইহার প্রতি মধুসূদনের আসক্তি সীমাহীন। এই নারীর প্রতিষ্ঠা মধুসূদনের কাব্যে—রবীন্দ্রনাথে তাহারই পরিণতি। প্রমীলা চরিত্র তাই এত উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু জননী জাহ্নবী দেবীকে ভুলিবেন কী করিয়া? নির্জন ব্যথার তীর্থে যে আত্মার ক্রন্দন তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাকে ভুলিবেন কী করিয়া? ভুলিতে তিনি পারেন নাই; পারা সম্ভব নয়। জনম দুঃখিনী সীতার জন্য কবির করুণা-কমণ্ডলুর সবটুকু বারি নিবেদিত হইয়াছে। সীতা চিরন্তন মাতৃমূর্তি—

আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়

হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;

[দুই নারী : বলাকা—রবীন্দ্রনাথ]

এই দুই নারীকে রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বে মধুসূদন প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন। একটিতে রতি, অপরটিতে আরতি। একের প্রেম রাজসিক, অপরের প্রেম আত্মিক। একের মধ্যে নিবিড় মিলনের ব্যাকুলতা অপরের মধ্যে গভীর প্রশান্তির বারতা। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বাতাবরণের অন্ধ-আনুগত্যে যে নারী আপন স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে নাই, যাহার বেদনা বিদ্যাসাগরের হৃদয়-মন ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই আবৃত স্বরূপ নারীমূর্তি মধুকবির কল্পনার অপরূপ রশ্মিপাতে এক অসামান্য চরিত্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে চরিত্র প্রমীলার। আর যে নারী বাহিরের কলকোলাহলের উর্ধ্বে আপনাকে স্থাপন করিয়া "আমাদের গৃহসংসারের যজ্ঞ বেদিকায় নিত্যসেবার হোমানল জ্বালিয়া দুই করপুটে নিজের তনুমনঃপ্রাণ আহুতি দিয়া থাকে", আমাদের সমস্ত দুঃখ পরিতাপের উপর স্নেহের, প্রীতির ও করুণার সুস্নিগ্ধ চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া জননান্তর সৌহৃদ স্মৃতি জাগাইয়া তুলে, তাহাকেও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি সীতা।

সীতা সম্পর্কে মধুকবির শ্রদ্ধা যতই গভীর ও নিবিড় হউক, সীতা মধুসূদনের মানস-দুহিতা নহে। সে গৌরব প্রমীলার। এই প্রমীলাই বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকাগণের ভূমিকা-চরিত্র। প্রমীলার বিশেষণ হিসাবে মধুসূদন বীরাঙ্গনা শব্দটিও ব্যবহার করিয়াছেন—,

দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি,
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিলা কৌতুকে ;

ললিতে-কঠোরে এ এক অসাধারণ চরিত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যের ক্যামিলা, ক্লারিণ্ডা ইত্যাদি বীর নারীর বীর্যবত্তার সহিত ভারতীয় নারীর নম্রতা, স্নিগ্ধ কোমলতার অন্বয় গ্রহণে প্রমীলা গঠিত। প্রতীচ্যের

জীবনে ও সাহিত্যে কবি যে আকাঙ্ক্ষা-তপ্ত কামনা-মধুর প্রেমের অত্যাগ দহন-জ্বালার বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কবিকল্পনার সপ্তচ্ছন্দ বর্ণমালায় তাহাই প্রমীলা চরিত্রে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা মানবতাবাদেরই প্রধান লক্ষণ। নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধায়, নারীত্বের মহিমায় মধুসূদনের কাব্য প্রোজ্জ্বল।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীর চিত্ততটে যে কূলহারা আবেগের সৃষ্টি হইয়াছিল, কেবল তাহারই ভাবরূপ নহে, এই অস্থিরতার ঊর্ধ্বে দুই বিরোধী সংস্কৃতির সমন্বয়ের অন্তর্চিত্রও মধুসূদনের কাব্যে প্রতিফলিত। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়াই ভারতীয় চেতনা আত্মস্থতা লাভ করিয়াছিল, নবীনমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। প্রমীলা চরিত্র সেই সমন্বয়ের সার্থক প্রকাশ। এই চরিত্রে প্রতীচ্যের অমিত তেজস্বিনী নায়িকাদের সঙ্গে বাঙালী গৃহস্থের কুলবধূর, ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় বীরাঙ্গনার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যে যে অসাধারণ কীর্তি-কুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার মূলেও ছিল সেই সমন্বয়ী প্রতিভা। বঙ্কিমসৃষ্ট নারীচরিত্রেও সেই সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনই আমাদের দাম্পত্যপ্রেমকে সংকীর্ণ গৃহজীবনের বলয়-রেখা হইতে বিশ্বের বিস্তৃত পটভূমিকায় প্রসারিত করিয়া দেন। এই চেতনার সরণী বাহিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেমের মহনীয় রূপ প্রকাশ করাই মধুকবির লক্ষ্য ছিল; জীবনের সর্ব অবস্থায় সেই প্রেমের মহত্ত্ব তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—

'দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ
সে দুর্গমে চলুক তোমার জয় রথ।' [মহুয়া—রবীন্দ্রনাথ]

তাই প্রমীলার বীরভূষণ ও নারীভূষণ বিপরীত চিত্র নহে। সমস্ত কিছুর মূলেই সেই প্রেম—যে প্রেম দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর পথ ধরিয়া

চলিতেও পশ্চাৎপদ হয় না, আবার নিভৃত নিকুঞ্জে প্রেমালাপনেও সময় অতিবাহিত করে। প্রমীলার সহমরণের মধ্য দিয়াও সেই প্রেমের গৌরবই প্রকাশ পাইয়াছে। কোন সমালোচক ইহার মধ্যে হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য ও সহমরণ প্রথার গৌরব দেখিয়াছেন, কোন বিদগ্ধ সমালোচক সহমরণ যাত্রার কারুণ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার কোনটাই সত্য নহে। রেনেসাঁসের চেতনায় প্রত্যয়বান মধুসূদন সহমরণকে সমর্থন করিতে পারেন না। রেনেসাঁসের প্রথম পুরুষ রামমোহনই ইহার সম্পর্কে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় অমানুষিক সামাজিক প্রথা সতীদাহ আইনের সহায়তায় নিবারিত হয়। নব মানবতার প্রাণপুরুষ মধুসূদন সংকীর্ণ সামাজিক প্রথার যূপকাষ্ঠে তাঁহার মানসকন্যাকে বলি দিবেন ইহা অসম্ভব, অভাবিত। প্রমীলার প্রেম মুহূর্তেরও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না।—'নিমিখে মানয়ে বহুযুগ।' সেই বিচ্ছেদ-বেদনা ভুলিবার জন্যই প্রমীলার বীরাঙ্গনা বেশে অভিসার যাত্রা। সেই নারী চিত্ত, তাঁহার নিবিড় প্রেমাকাঙ্ক্ষা স্বামীর সহিত সহমরণে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিল। ইহাই প্রেমের মৃত্যুঞ্জয় গৌরব।

প্রমীলার অভিসার প্রসঙ্গে কি কবির শ্রীরাধিকার অভিসারের কথা মনে পড়িয়াছিল? শ্রীরাধিকার অভিসারও প্রেমের নিঃসীম গভীরতাকেই দ্যোতিত করে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে শ্রীরাধিকা এবং কেলি কদম্বকুঞ্জ কবিকে বার বার আকর্ষণ করিয়াছে। রসোজ্জ্বল বাঙালী পাঠকের মুখাপেক্ষী হইয়া সুলভ খ্যাতির প্রলোভনে তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ তাঁহার কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই—ইহার সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। ধর্মান্তরিত হইলেও খ্রীষ্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের সহিত তাঁহার কোন যোগ ছিল না, বরং জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা শেষ পর্যন্ত অবারিত ছিল। চিঠিপত্রের মধ্যে ইহার অজস্র প্রমাণ ছড়াইয়া আছে। শুধু চিঠিপত্রের মধ্যেই নহে, কাব্য-

নাটকের উপমা উৎপ্রেক্ষায় নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ এবং কদম্বকুঞ্জ বার বার আবর্তিত হইয়াছে। এক মেঘনাদবধের প্রায় প্রতিটি সর্গেই এই ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই সকল উপমা-উৎপ্রেক্ষার পশ্চাতে মধুসূদনের কবিমানসের প্রবণতা অনুভব করা দুরূহ নহে। মেঘনাদবধ কাব্য সমাপ্তির মুখে তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন—

"I suppose I must bid adieu to Heroic poetry after Meghnad. A fresh attempt would be something lil e repetition. But there is the wide field of romantic and lyric poetry before me and I think I have a tendency in the lyrical way."

অভ্রান্ত কবিসংস্কারের ফলেই এ সত্য তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সত্য উপলব্ধিতেই ইহার শেষ নয়, আধুনিক গীতিকাব্যেরও তিনি পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মহাকাব্যের যুগ শেষ হইয়াছে। যে যুগসন্ধিক্ষণে মহাকাব্যের জন্ম, সেই সন্ধিলগ্নের বিচিত্র অভিব্যক্তি মেঘনাদবধে নিঃশেষিত হইয়াছে, এমন কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না যাহার দ্বারা নূতন মহাকাব্য রচিত হইতে পারে। অন্যদিকে ব্যক্তি ও সমাজ মানসের দ্বন্দ্ব, জীবনের বহু বঙ্কিম অভিজ্ঞতা ও জটিলতা উপন্যাসের পটভূমি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং একান্ত বাস্তব কারণেও আর মহাকাব্য রচনা সম্ভব নহে। মধুসূদন যে গীতি-ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন, তাহা যেমন সেকালের দিক হইতেও উপযুক্ত, বাঙলা সাহিত্যের সনাতন ঐতিহ্যেরও অনুসারী। মেঘনাদবধেও এই গীতি আকুলতার পরিচয় আছে। সীতা চরিত্রের কল্পনামূলে প্রাচ্য সংস্কারই যে জয়ী হইয়াছে তাহাই নহে, মহাকাব্যের উদারবিভূতির মধ্যে সীতা-চরিত্র লিরিক

সৌন্দর্যের এক খণ্ড আকাশ। আর এই পথ বাহিয়াই ব্রজাঙ্গনার গীতিসুর ঝংকৃত।

ব্রজাঙ্গনার নিভৃত উৎস বাঙালীর জীবনকেন্দ্রে। মধুসূদনের বাঙালী-প্রাণতা ইহার মধ্য দিয়া স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। বাঙালী নারীর অন্তর্জীবনের বিপুল বেদনা ও রুদ্ধ রোদনাবেগ ইহার মধ্যে গুঞ্জিত হইয়া আছে।

পৃথিবীর ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহার ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ, হিন্দু কলেজের যুক্তিমার্গিক আবহাওয়ায় যাঁহার পাশ্চাত্ত্য-প্রীতি বিকাশ-প্রাপ্ত, রামমোহন-ডিরোজিওর যিনি পরোক্ষ শিষ্য, তাঁহার পক্ষে তৎকালীন বহুনিন্দিত রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু হৃদয়পাশে বন্দিনী শ্রীরাধিকার মধ্যেই কবি বাঙালী নারীর প্রতিচ্ছবিও যেমন দেখিয়াছিলেন, তেমনি শ্রীরাধিকার মধ্যে নারীত্বের সম্ভাবনার দিকটিও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অবশ্য বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনাতেই কবি তাঁহার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকার কিন্তু একটি রূপের মধ্যে পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্তব্য নহে; পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মাথুর, প্রেমবৈচিত্ত্য ও ভাবসম্মেলনের বিচিত্র অবস্থার মধ্যে তাহাকে স্থাপিত করিয়া কবিগণ নানাভাবে তাহার চরিত্র আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বৈষ্ণব কবিগণের ঐ সকল বিভাগ, উপবিভাগ, নায়িকার বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা সত্ত্বেও মানবজীবনের বিপুল বৈচিত্র্য প্রকাশে সমর্থ নহে। মধুসূদন তাই সে চেষ্টা করেন নাই। নারীচরিত্রের অনন্ত বিস্তার ও বিপুল বৈচিত্র্য প্রকাশের প্রচেষ্টা হইতেই 'বীরাঙ্গনার' উদ্ভব।

(৬)

'বীরাঙ্গনা'ই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ও শেষ পত্রিকা কাব্য। এ পথের একক যাত্রী মধুসূদন।

'বীরাঙ্গনা' কাব্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে প্রাক্-বীরাঙ্গনার অঙ্গনাদের ভুলিলে চলিবে না। নারীর সৌন্দর্যচেতনা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, নারীত্বের প্রতি সম্মান নবজাগৃতির আদর্শের উদ্‌বোধন ঘটাইয়াছে। আত্ম-প্রত্যয়বান, শব্দসচেতন কবি মধুসূদন বীরাঙ্গনা নামকরণের মধ্যেই শ্রদ্ধা ও সৌন্দর্যের এক মিলিত পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্যের নামকরণের গভীরতা অনেক সমালোচক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজেও বিভ্রান্ত হইয়াছেন, অপরকেও বিভ্রান্ত করিয়াছেন। মধুসূদন সম্পর্কে কোন স্পর্দ্ধিত উক্তি প্রকাশ করিবার পূর্বে একটু বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। বীরাঙ্গনা শব্দের অর্থ শুধু বীরনারী ধরিলে নিজেদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। বীরাঙ্গনা কাব্যের নামকরণের তাৎপর্য অনুধাবনের পূর্বে সাধারণভাবে বীরাঙ্গনা সম্পর্কে মধুসূদনের বক্তব্য জানা দরকার।

......But within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called 'বীরাঙ্গনা' *i.e.*, Heroic epistles from the most noted puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty one epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder. ...The first series contain (1) Sacuntala to Dusmanta, (2) Tara to Some, (3) Rukmini to Dwarakanath, (4) Kakayee to Dasarath, (5) Surpanakha to Lakshman, (6) Droupadi to Arjuna, (7) Bhanumati to Durjodhana, (8) Duhsala to Jayadratha, (9) Jana to

Niladhwaja. (10) Jahnavi to Santanu. (11) Urbasi to Pururabas ; a goodly list, my friend......But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse !

মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যে যে একাদশটি পত্রিকা রচনা করিয়াছেন তাহারা কেহই বীর নারী নহে। মধুসূদনের ভাষায় Most noted puranic women to their lovers or lords. এই noted women বলিতে মধুসূদন কী বুঝিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে। একাদশ পত্রিকার মধ্যে দ্রৌপদী, ভানুমতী, দুঃশলা এবং জনা—এই চারিজন ক্ষাত্ররমণী হইলেও, ক্ষাত্ররমণীসুলভ তেজস্বিতার পরিচয় একমাত্র জনা ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে লক্ষ্যগোচর হয় না। আবার মধুসূদনের পরিকল্পনা অনুসারে জনা পত্রিকা দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত। কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন—The epistles of poor জনা must be revised and printed along with the second set. I am very unpoetical just now. God knows in what all this trouble, anxiety and vexation will end. মানসিক অশান্তি, অস্থিরতা ও নানা দুর্বিপাকের জন্য তিনি তাঁহার কল্পনাকে রূপদান করিতে সমর্থ হন নাই। মধুসূদনের পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব রচিত হইলে, কবির মতানুসারে জনা দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত হইত নিঃসন্দেহে। এবং সে ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের নামও বীরাঙ্গনাই থাকিত এবং জনা পত্রিকা ব্যতিরেকেই ইহার নামকরণের সার্থকতা বিচার করিতে হইত। এখন জনাকে বাদ দিলে ক্ষাত্র রমণী থাকে তিনজন—দ্রৌপদী, দুঃশলা ও ভানুমতী। দ্রৌপদীর পত্রে স্বামীর বীর্যবত্তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ

পাইলেও নিজের প্রেমময়ী সত্তাটিকেই সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বাকী দুইটি ক্ষাত্র নারী চরিত্র—দুঃশলা ও ভানুমতীর চরিত্রে বীর্যবত্তা তো নাইই, বরং তাহার বিপরীত চিত্রই আমরা লক্ষ্য করি।

পত্রিকারম্ভে ভানুমতী লিখিয়াছেন—

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র রণে
নাহি নিদ্রা, নাহি রুচি, হে নাথ আহারে।

বীর্যবতী রমণী চরিত্র অঙ্কনের বাসনা মধুসূদনের থাকিলে, কখনই ভানুমতীর মুখে এবম্প্রকার সংলাপ সংযুক্ত করিতেন না। ক্ষত্রিয় নৃপতির নিকট যুদ্ধ-বিগ্রহ আকস্মিক ব্যাপার নহে, তাহা চূড়ান্ত ভীতিপ্রদও নহে। কেমন ক্ষত্রিয় নৃপতির স্ত্রী হইয়া যুদ্ধের নামে মূর্ছা যাইবেন, ইহা অকল্পিত। সুতরাং ক্ষত্রিয় রমণীর বীর্য প্রকাশ করিবার জন্য মধুসূদন লেখনী ধারণ করেন নাই। ভানুমতী যে শুধু স্বামীর গমনের পর হইতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন তাহাই নহে, দুর্যোধনের করুণ পরিণতিও তিনি স্বপ্নঘোরে লক্ষ্য করিয়াছেন—

অদূরে দেখিনু হ্রদ, সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন উরু!

দুঃশলাও স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছেন—

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি!
ফেলি দূরে বর্ম, চর্ম, অসি, তূণ, ধনু;
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে
... ...
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে।

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে বীর নারী চরিত্র অঙ্কন মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি শুনিবামাত্র রাণী দুর্গাবতী, ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর কথা যাঁহাদের মনে পড়িয়া যায় এবং সেই আদর্শে বীরাঙ্গনার চরিত্র ও নামকরণের সার্থকতা বিচার করিতে বসেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বীরাঙ্গনা শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে বীরা ও অঙ্গনা—দুইটি শব্দ পাওয়া যায়। বীরা শব্দের অর্থ যে নারীর পতি ও পুত্র বর্তমান। ইহার বিপরীতেই অবীরা শব্দটি গঠিত হইয়াছে। এখন বীরা শব্দ ধরিয়া বীরাঙ্গনার অর্থ বিচার করিতে গেলে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িতে হইবে। বীরাঙ্গনার কোন নায়িকার পতি ও পুত্র বর্তমান থাকিলেও, প্রত্যেক নায়িকা সম্পর্কে তাহা প্রযোজ্য নহে। তদুপরি নায়িকাদের মধ্যে, কেহ বা কুমারী, কেহবা বিধবা, কেহ না বারবনিতা এবং কেহবা বিবাহিত হইলেও অপুত্রক। সুতরাং এ স্থানে বীরা শব্দটি গ্রহণীয় নহে।

বীরাঙ্গনা কাব্য সম্পর্কে মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রারম্ভিক কবিতা 'উপক্রমে' যাহা বলিয়াছেন তাহাও স্মরণ করা দরকার—

বিরহ লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীরজায়া পক্ষে বীর-পতি গ্রামে ;

এখানে বীরাঙ্গনা বীর রমণী অর্থে গ্রহণ করেন নাই। বরং নায়িকা হিসাবে অর্থ গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

কোন এক সমালোচক বলিয়াছেন যে এই কাব্যের নারীগণ সাহসের সহিত আপন অন্তর্জীবনের কথা অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন— বীরত্বের সহিত আত্মঘোষণার জন্য এই নাম পরিকল্পিত হইয়াছে। কাব্যের তাবৎ নায়িকার মনোধর্মের নিরিখে এই মন্তব্য অযথার্থ নহে। তবে বীরাঙ্গনা শব্দ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে চিন্তা করিবার আছে।

বীর শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে বি+√ঈর পাওয়া যায়। ইহার অর্থ বিশিষ্ট প্রেরণা। বীর+অক (অমরস্থ চূ. প.—বীরয়তি)—অর্থ উত্তম।* সায়নও এই অর্থ স্বীকার করিয়াছেন—'বীরায় প্রেরয়িত্রে'। এই অর্থে বীরাঙ্গনার অর্থ ধরিলে অর্থ হয় বিশিষ্ট প্রেরণাদাত্রী নারী। নারী তো পুরুষের মনে প্রেরণা জাগায়। বীরাঙ্গনা কাব্যের অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী কবিতায় ইহার স্পষ্ট পরিচয় আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনকে সভাস্থ সকল নৃপতি যখন বেষ্টন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন অর্জুন দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি,
চন্দ্রমুখি! [অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী]

এই অর্থ শুধু অভিধানেই লিপিবদ্ধ নহে, মধুস্থদনের কাব্যেও ইহার সমর্থন আছে। এবং এবম্প্রকার অর্থবিচার যুক্তিসহ ও যথার্থ। কিন্তু ইহা মধুস্থদনের Most noted puranic women নয়। অর্থাৎ বীরের এই অর্থ গ্রহণযোগ্য হইলেও ইহা মধুস্থদনের অভিলষিত অর্থ নহে।

বীর শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় √বীর–অ (অচ) ক। ইহার অর্থ শ্রেষ্ঠ বা উত্তম। তিনলিঙ্গে একই ব্যবহার। হেমচন্দ্রও এই অর্থের নির্দেশ দিয়াছেন। এই অর্থ মূল বেদের মধ্যেই গৃহীত হইয়াছে। আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ঋগ্বেদের শ্লোকটির অনুসরণ করা যাইতে পারে—

ইদা হি বো বিধতে রত্নমস্তীদা
বীরায় দাশুষ উষাসঃ॥ [ঋগ্বেদ—৬ : ৬৫ : ৪]

কেবল সংস্কৃতেই নহে বাঙ্‌লা ভাষাতেও বীর শব্দ শ্রেষ্ঠ অর্থে বহুস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। চিন্তাবীর, ধর্মবীর, কর্মবীর শব্দগুলি এই প্রসঙ্গে

* বঙ্গীয় শব্দকোষ।

স্মর্তব্য। চিন্তাবীর শব্দটিই ধরা যাক। ইহার অর্থ চিন্তায় যিনি বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—এমন নিশ্চয়ই নহে। ইহার অর্থ শ্রেষ্ঠ চিন্তক। অভিধানও এই অর্থই নির্দেশ করিতেছে। সুতরাং বাঙ্‌লাতেও বীর অর্থে শ্রেষ্ঠ প্রযুক্ত।

এখন বীরাঙ্গনা শব্দটিকে ভাঙিলে বীর ও অঙ্গনা পাওয়া যায়। বীর শব্দটি এখানে অঙ্গনার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং বীরাঙ্গনা শব্দটির অর্থ হইল শ্রেষ্ঠা নারী।

কিন্তু ইহাই সবটুকু নহে। অঙ্গনা শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে আরও উল্লেখযোগ্য পরিচয় লাভ করিতে পারিব। কারণ অঙ্গনার অর্থ শুধুমাত্র নারী, ললনা, কামিনী বা রমণী নহে। অঙ্গনা শব্দের বিভাজনে পাওয়া পাওয়া যায়—অঙ্গ + ন (প্রশংসার্থে) + আ (স্ত্রীলিঙ্গে) — অঙ্গ সুন্দর যে নারীর। অতএব বীরাঙ্গনা শব্দটির অর্থ হইল শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী। এই শ্রেষ্ঠতা অবশ্য বীর্যের বিচারে। সুতরাং বীরাঙ্গনা শব্দটির মধ্যেই বীর্য ও সৌন্দর্যের মিলিত পরিচয় নিহিত আছে। মধুসূদন ইহাকেই বলিয়াছেন Most noted puranic women। রেনেসাঁসের চেতনায় প্রত্যয়বান মধুসূদন সৌন্দর্য মাধুর্যের সঙ্গে বীর্যের সম্মিলন ঘটাইয়া নারীকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। নারীদেহকে স্থূল দেহপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার যন্ত্ররূপে দেখেন নাই, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য-চেতনা জাগ্রত করিয়াছেন। তিনি কেবল নারীর অশ্রুসজল বিষাদিনী মূর্তিই অঙ্কন করেন নাই প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী মূর্তিও উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহারই পূর্ণতম অভিব্যক্তি বীরাঙ্গনা কাব্যে।

নবযুগের স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীকে অঙ্গনা ছাড়া আর কোন শব্দে বিশেষিত করা যায়? শব্দসচেতন কবি মধুসূদন সঙ্গতভাবেই ঐ নামকরণ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য কোন স্ত্রী-বাচক শব্দের মধ্যে এমন

সুরুচি, সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের পরিচয় মিলিবে না। অঙ্গনার সমগোত্রীয় শব্দ—নারী, ললনা, কামিনী, রমণী ইত্যাদি শব্দগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করিলেই আমাদের উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন হইবে। নারী শব্দ নর নির্ভর—সুতরাং এই শব্দ নারীর স্বাতন্ত্র্যবিকাশের সহায়ক নহে। যে নারী কেবল পুরুষের মুখাপেক্ষী সে নারী মধুসূদনের মানস-দুহিতা হইবার যোগ্যতা রাখে না। নারী শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় নর+অ (ষ্ণ)+ঈপ (ধর্মার্থে)—অর্থাৎ মনুষ্যজাতির যে অংশ সন্তান প্রসব করে। নারী শব্দ প্রাচীন প্রবচন 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'-কেই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরব কোনটাই প্রকাশ পায় না। এমন শব্দ মধুসূদন গ্রহণ করেন নাই। নারীর অপর প্রতিশব্দ ললনা—লল্+অনট—অর্থাৎ কটাক্ষ, ভঙ্গী প্রদর্শনকারী রমণী। ছলাকলায় এই ললনা অভিজ্ঞা। এই ললনার পরিচয় পাইতে হইলে ভারতচন্দ্রই যথেষ্ট, তাহার জন্য মধুসূদনের প্রয়োজন নাই। নারীর প্রতিশব্দ কামিনী ধরিলে অর্থ হয় কামময়ী নারী—কাম+ইন্ (অস্ত্যর্থে)+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)। মধুসূদনের নারী চরিত্রে কামের পারবশ্য নাই, আছে প্রেমের বীর্য। কামের ঊর্ধ্বে প্রেমকে মধুসূদনই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা দেন। তাঁহার জীবনে ও কাব্যে ইহার পরিচয় ছড়াইয়া আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মধুসূদন কামিনী শব্দ গ্রহণ করেন নাই। কামের মধ্য দিয়াই কি তাহার একমাত্র পরিচয়? নারীত্বের ব্যঞ্জনা ইহার মধ্যে কোথায়? রমণী শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় —√রম্+নিচ্+অন (র্তৃ)+ঈ (স্ত্রী)—ইহার শব্দার্থ হইল রমণকারিণী অর্থাৎ রতিক্রিয়াকারিণী নারী। শব্দটির মধ্যে মধুসূদন অবশ্যই সুরুচি ও শিষ্টতা খুঁজিয়া পান নাই। সতী, সাধ্বী শব্দগুলি বহু ব্যবহারে মলিন এবং উহাদের ব্যবহার একপক্ষের। অভ্রান্ত কবিসংস্কারের ফলেই মধুসূদন অঙ্গনা শব্দটিকে বাছিয়া লইয়াছেন। স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীর

পরিচয়ে, সৌন্দর্য ও প্রেমের বীর্যে বীরাঙ্গনার প্রতিটি চরিত্রই অনন্য-সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং মধুকবির বীরাঙ্গনা নাম সার্থক ত বটেই, উহাই একমাত্র নাম—উহা ব্যতীত অন্য কোন নামে অভিহিত করিলে মধুসূদনের মূলভাব রক্ষিত হইত না।

(৭)

মধুসূদন এক পত্রে লিখিতেছেন—The new poem is just out, and I have ordered a copy to be forwarded to you. You must oblige me by letting me know what you think of it at your earliest convenience, for I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry. You have a higher appreciation of the art than is at all common in this land of the sun. As for the old school, nothing is poetry to them which is not an echo of sanskrit—they have no notion of originality ; as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read !

The poem, you will find, has not been concluded yet—one half of it remains to be written. I don't know when I shall finish it. Perhaps it will take me months, perhaps few weeks. But give me your candid opinion of what has already been achieved, old fellow ! I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow ! I assure you, I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new poetry are very flattering, tho', he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest for he is above flattering any man.

এই বীরাঙ্গনা কাব্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মধুসূদন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি আকস্মিক নহে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বীরাঙ্গনায় কবি নারীর যে নবমহিমা আবিষ্কার করিয়াছেন, যেভাবে সৌন্দর্য মাধুর্যের সঙ্গে বীর্যের সমন্বয় ঘটাইয়া মহীয়সী মহিলার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, তাহাদেরকে অর্পণ করিবার একমাত্র ব্যক্তি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর সে যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ত বটেই, নারীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাশীলও তিনি। তাঁহার এই শ্রদ্ধা জ্ঞান ও মননের পথ বাহিয়া নহে, প্রতীচ্যের ভাবাদর্শে নহে, তাঁহার হৃদয়-মনপ্রাণের নিবিড়তম সত্যে উদ্ভাসিত। বিদ্যাসাগরের পরিচয় বিদ্যাতেও নহে, দয়ার ক্ষেত্রেও নহে, জীবন্ত পুরুষকারে, সত্য ন্যায়ধর্মের অবিচলিত দৃঢ়তায়,—এককথায় চরিত্রধর্মে। চরিত্রধর্মে বিদ্যাসাগর একমাত্র নিজেরই তুলনা। দেব-দুর্লভ-চরিত্র বিদ্যাসাগরকে মধুসূদন কোন কদর্য বস্তু উপহার দিবেন ইহা অভাবিত। পরবর্তী আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করিব যে মূল কাহিনীর কদর্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া মধুসূদন কীভাবে তাহার মধ্যে নারীর মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।*

সংস্কৃত আলঙ্কারিক বিচারের তুচ্ছতা হইতে মধুসূদন তাঁহার কাব্যকে মুক্তি দিয়াছেন ভাবের স্বাধীন লোকে। তাই মধুসূদন যথার্থ স্রষ্টা।

(৮)

বীরাঙ্গনা কাব্যের কয়েকটি পত্রিকা সম্পর্কে—বস্তুতঃ কয়েকটি নারী-চরিত্র চিত্রণায় মধুসূদনের রুচির নিম্নগামিতা কোন কোন সমালোচক

* বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম পত্রিকা দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা। এই পত্রিকাকে সর্ব-প্রথমে স্থাপন করিবার হেতু কি? গ্রন্থটি তিনি বিদ্যাসাগরকে অর্পণ করিয়াছেন; বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রচনা শকুন্তলাকে কবি ভুলিতে পারেন নাই। ইহাও বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধার এক বিচিত্র প্রকাশ।

লক্ষ্য করিয়াছেন। কোনও সমালোচক পুরাণে বর্ণিত পত্রিকা অপেক্ষা মধুস্থদনের পত্রবিশেষ নিকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া রায় দিয়াছেন। এবং অদ্যাবধি এই মতবাদ সাধারণ্যে প্রচারিত। স্থতরাং বিষয় দুইটি একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। একটি অভিযোগ মধুস্থদনের 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রিকার প্রতি। ভাগবতে রুক্মিণীর যে পত্রিকা আছে তাহার তুলনায় মধুস্থদনের রুক্মিণীর পত্রিকা নাকি আদৌ জমে নাই। বিষয়টি বিচার করিতে হইলে ভাগবতের রুক্মিণীর পত্রের সহিত পরিচয় থাকা দরকার। সেজন্য আমরা ভাগবতের রুক্মিণীর মূল লিপিখানির যথাযথ অনুবাদ সন্নিবেশিত করিলাম—

"হে অচ্যুত! হে ভুবনের স্থন্দর! আপনার যে সকল গুণ কর্ণকুহর দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গের অঙ্গতাপ হরণ করে, সেই সকল গুণ এবং আপনার যে রূপ দৃষ্টিশালী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টির যাবতীয় অর্থের লাভ-স্বরূপ, সেই রূপ শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নির্লজ্জ হইয়া আপনাতে আসক্ত হইতেছে। হে মুকুন্দ! আপনি, কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, বয়ঃক্রম, দ্রব্য-সম্পত্তি ও প্রভাবে আপনার নিজেরই তুল্য। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনা হইতে লোকে আনন্দলাভ করিয়া থাকে: বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কোন্ কুলবতী গুণশ্রেষ্ঠা, ধীমতী কামিনী আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী না হন? বিভো! এই কারণে আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ এবং আত্মা সমর্পণ করিয়াছি। হে কমলাক্ষ! শৃগাল সিংহের বলি অপহরণ না করে,—চৈদ্য যেন শীঘ্র আসিয়া বীরের ভাগ স্পর্শ না করে। যদি পূর্ত, ইষ্ট, দান, নিয়ম, ব্রত এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অর্চনাদি দ্বারা ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে দমঘোষ তনয় প্রভৃতি অন্যকেহই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহা হইলে গদাগ্রজ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন—অতএব আপনি অদ্য প্রথমেতঃ গুপ্তভাবে

আগমন করুন; পশ্চাৎ সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া, চৈদ্য ও মগধরাজের সেনাবল মন্থনপূর্বক বীর্যরূপ শুল্ক দিয়া, রাক্ষস-বিধানানুসারে আমাকে বিবাহ করুন। যদি বলেন—তুমি অন্তঃপুরের মধ্যে অবস্থান কর, তোমার বন্ধুদিগকে সংহার না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব? তাহার উপায় বলি—বিবাহের পূর্বদিনে আমাদের মহতী কুলদেবযাত্রা হইয়া থাকে, ঐ যাত্রায় নববধূকে পুরের বহিঃস্থা অম্বিকার নিকট গমন করিতে হয়। হে কমললোচন! উমাপতির ন্যায় মহৎ ব্যক্তি সকল, আত্মার অজ্ঞান নাশের নিমিত্ত যে আপনার চরণরজঃ প্রার্থনা করেন, আমি যদি সেই আপনার প্রসাদ লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে ব্রত দ্বারা কৃশ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব; শতজন্মেও আপনার অনুগ্রহ হইতে পারিবে।"

এই পত্রিকাটির সহিত মধুসূদনের পত্রিকাটি মিলাইয়া পড়িলেই বাস্তব-বুদ্ধিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রুক্মিণী পত্রিকাতে কবি কি ভাগবতেরই অনুসরণ করিয়াছেন অথবা প্রেমসম্পর্কে কবির বিশিষ্ট ভাবানুভূতিই এখানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে? ভাগবতের রুক্মিণীর পত্রিকা বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি বিষয় সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। প্রথমতঃ এই প্রেম রূপ-গুণ-বিষয়াদি এমনকি বয়ঃক্রমের অপেক্ষা রাখে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণের এবম্প্রকার রূপ-গুণ-বয়ঃক্রম বিষয়াদির জন্য প্রত্যেক নারীই তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিতে চাহে বলিয়া তিনিও তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহেন। এখানেও রুক্মিণী অন্যাপেক্ষী। তৃতীয়তঃ রুক্মিণীর ধর্মচেতনা—এই ধর্মীয় অলৌকিক শক্তির দ্বারাই তিনি সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার ধারণা। ইহার মধ্যে প্রেমচেতনা অপেক্ষা ধর্মীয় চেতনারই প্রাধান্য। কৃষ্ণকে লাভ করিতে না পারিলে ব্রতধর্মের দ্বারা প্রাণত্যাগের ভয় অবশ্য তিনি দেখাইয়াছেন

এবং কি কৌশলে তাঁহাকে হরণ করিতে হইবে তাহারও সুচিন্তিত নির্দেশ দান করিয়াছেন। মধুসূদনের রুক্মিণী অবশ্য এ সকল কিছু করে নাই। কোন কলাকৌশল তাঁহার জানা ছিল না। তিনি কেবল আপন কুমারী হৃদয়টি মেলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তব্যের মূলে এক রোমান্টিক আকৃতি। অনুরাগে, লজ্জায়, দ্বিধায়, শরমে কিশোরী হৃদয়টি অপরূপ রূপে ও ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জা ভয়ে। মুঁদে আঁখি, হে দেব, শরমে
না পারে আঙুলকুল ধরিতে লেখনী,
কাঁপে হিয়া থরথরে।

প্রেমের এমন শরমকুণ্ঠিত লজ্জারুণ চিত্র মধুসূদনের পূর্বে বাঙ্‌লা সাহিত্যে নাই। কিন্তু এহ বাহ্য। ভাগবতের রুক্মিণী হইতে মধুসূদনের রুক্মিণী সম্পূর্ণ পৃথক। ভাগবতের রুক্মিণীর প্রেম ইন্দ্রিয়জ। কুলবতী কামিনীগণ কৃষ্ণকে তনুমনপ্রাণ সমর্পণ করে বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ-সমর্পিতা। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এ প্রেম অন্যাপেক্ষী। একনিষ্ঠতার ধারণা অবশ্য আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বহু বল্লভতাকে ইঙ্গিতে সমর্থনও করিয়াছেন। ব্রতদ্বারা প্রাণত্যাগের কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা যে পরিমাণ ধর্মবোধ আশ্রয়ী, সে পরিমাণ প্রেম চেতনা আশ্রয়ী নহে। মধুসূদনও প্রেমকে একেবারে আদর্শায়িত করিয়া বিশুদ্ধ ভাবস্বপ্নের মধ্যে প্রেমকে প্রত্যক্ষ করেন নাই; বাস্তব মৃত্তিকার সংস্পর্শ হইতে দূরে ফেলিয়া দেন নাই। মধুসূদনের প্রেম দেহ ও আত্মার সম্মিলিত আধারে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। নগ্ন দেহচেতনা হইতে তিনি প্রেমকে উন্মুক্ত করিয়াছেন, দেহবিস্মৃতি

হইতেও তিনি প্রেমকে রক্ষা করিয়াছেন। মধুসূদনের রুক্মিণীর প্রেম রূপজ হইলেও তাহার মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়বিকার নাই; এ প্রেম অন্যাপেক্ষী নহে। ইহা দেহমন প্রাণের—তাঁহার আত্মার এক অনুভূত সত্য—তাই ইহা প্রেমের রতি নহে, প্রেমের আরতি—আরও যথার্থভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি—

হৃদয়মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মূর্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে।

ইহা কেবল তাঁহার মুখের কথা মাত্র নহে, আন্তর সত্য। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে জগতকে কৃষ্ণময় দেখিয়াছেন—নীরদমালায়, আলুলায়িত কুন্তলদামে, ময়ূরের কণ্ঠে—বাহির বিশ্বে ও অন্তর বিশ্বে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। প্রেমের নিবিড়তম অনুভূতির ফলে রুক্মিণীও দ্বারকানাথের চিত্র চিরকালের জন্য অঙ্কন করিয়া লইয়া তাঁহারই পূজা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাগবতের পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মধ্যে প্রেমভাবুকতার যে আশ্চর্য চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহার প্রতিধ্বনিতেই পত্রিকাখানি এত মধুর হইয়া উঠিয়াছে। তাই এমন আশ্চর্য সুন্দর চিত্র আমরা লাভ করিয়াছি।

নবীন-নীরদবর্ণ; শিখিপুচ্ছ শিরে;
ত্রিভঙ্গ; সুগল দেশে বরগুঞ্জমালা;
মধুর অধরে বাঁশী; বাস পীত ধড়া
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন রাজীব চরণে—

নিজের দেশের পার্শ্ববাহিনী নদীকে যমুনা কল্পনা করিয়া তাহার তীরে তীরে তমালকদম্ব রোপণ করিয়া নববৃন্দাবন সৃষ্টির মধ্য দিয়া কি তাঁহার প্রেমের নিঃসীম গভীরতা দ্যোতিত হয় নাই? মধুসূদনের

রুক্মিণীর প্রেম যে কত সত্য তাহার নিশ্চিততম প্রমাণ তাঁহার নিশ্চিন্ত চিত্ততায়। এ বিশ্বাস প্রেমের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের ফলে তাঁহার মনে কোন দ্বিধা-সংশয় নাই। তাই তিনি স্পষ্টকণ্ঠে বলিতে পারেন—

কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে ;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এদেশে,
হর মোরে। হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে।

অথচ এই রুক্মিণী শরমে, দ্বিধায় পত্র লিখিতেও অসমর্থ ছিলেন। তাঁহাকে এই দুরূহ কার্যে ব্রতী করিয়াছে তাঁহার প্রেম। ভাগবতের রুক্মিণীর এতখানি প্রেমের গভীরতা ছিল না যাহার বলে তিনি নিঃসংশয়চিত্ত হইতে পারেন। তাই তাঁহার পত্রখানি সংশয়ের মধ্য দিয়াই সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ভাবের দিক হইতে, চরিত্র বিকাশের দিক হইতে মধুসূদনের রুক্মিণী কোন অংশে হীন নহে, বরং অধিকতর সার্থক। তবে ভাগবতের মূল পত্রিকাটির ভাষার গৌরব স্বীকার করিতে হয়—অবশ্য সে গৌরব সংস্কৃত ভাষারই—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশাত চিত্তমপত্রপং মে। ...ইত্যাদি।

মধুসূদন তারা-পত্রিকাটির জন্য অধিকতর সমালোচিত হইয়াছেন। প্রাচীন ও আধুনিক সমালোচকগণও নীতির বিচার হইতে পত্রিকাটিকে অব্যাহতি দেন নাই এবং এই পত্রিকা সম্পর্কে তাঁহাদের অভিযোগও গুরুতর। তাঁহাদের মতে মধুসূদন নাকি এই পত্রে কদর্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন। বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রয়োজনীয় অংশের যথাযথ অনুবাদ উপস্থিত করা হইতেছে।

"বৃহস্পতি-পত্নী নবযৌবনান্বিতা সতী তারা উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বসন ও রত্নভূষণসমূহে ভূষিতা হইয়াছিলেন। সেই পরম রূপলাবণ্যবতী সুন্দরীর শ্রোণিদেশ অতি সুন্দর ও বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ছিল এবং মালতীমালা-বেষ্টিত কবরীভারে তাঁহার শোভার সীমা ছিল না। তাঁহার ললাটের মধ্যস্থলে চতুর্দিকে মনোরম চন্দনবিন্দু ও অধোদেশে কস্তুরীবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু বিরাজ করিতেছিল এবং চরণযুগল উৎকৃষ্ট রত্নসারনির্মিত মধুর শব্দায়মান নূপুরভূষণে রঞ্জিত; সেই চারু কজ্জলোজ্জ্বলা শ্যামা সুবক্রলোচনার দন্তপংক্তি উৎকৃষ্ট সুচারু মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় মনোহর এবং চারুগণ্ডস্থল রত্নময় কুণ্ডলযুগ্মে সমুজ্জ্বল; সেই গজেন্দ্র-গামিনী, কামাধারা, কামুকী ললনা, সুকোমলাঙ্গী ও চন্দ্রমুখী। সেই অবলা স্বর্গ মন্দাকিনীর তীরে স্নানান্তে আর্দ্র বসনে পতির চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে স্বগৃহে গমনোন্মুখী হইয়াছেন, এমন সময় চন্দ্র তাঁহার সর্বাঙ্গ দর্শন করিয়া অনঙ্গবাণে পীড়িত হওয়ায় হতচেতন হইলেন। ...পরে বলশালী রথারূঢ় সুরসিক সুধাকর ক্ষণমধ্যে সংজ্ঞা-লাভ করিয়া কর ধারণপূর্বক তারাকে স্বরথে উত্তোলন করিলেন। অনন্তর কামোন্মত্ত চন্দ্র, কামুকীকে গাঢ়ালিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া শৃঙ্গারে উদ্যত হইলে গুরুপ্রিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—

তাজমাং তাজমাং চন্দ্র, সুরেষু কুলপাংশুক।
গুরুপত্নীং ব্রাহ্মণীঞ্চ, পতিব্রত-পরায়ণাং।
গুরুপত্নীসঙ্গমান ব্রহ্মহত্যাশতং লভেৎ।
পুত্রস্তং তব মাতাহং ধৈর্য্যং কুরু সুরেশ্বর।

আর গুরুপত্নী বা বিপ্রপত্নী পতিব্রতা হইলে তৎসঙ্গমে সহস্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে [illegible] তোমার এই কুৎসিত ব্যাপার শ্রবণ

করিলে তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন। পাপিষ্ঠ! তুমি আমার স্বামীর পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য; অতএব আমি তোমার মাতা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম রক্ষা কর। আর যদি আমাকে বলপূর্বক উপভোগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় স্ত্রীহত্যার পাতকী হইবে। তখন শশধর তারার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া সম্ভোগ করিতে উদ্যত হইলে সেই নিষ্কামা, পতিব্রতা তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন—

রাহুগ্রস্তো, ঘনগ্রস্তঃ পাপযুক্তোভবান ভব।
কলঙ্কীঃ যক্ষ্মাণাগ্রস্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥

অনন্তর চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়াও তাঁহাকে গ্রহণপূর্বক রমণ করিলেন। পরে সেই শোকান্বিতা, রোরুদ্যমানা গুরু-পত্নীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে শশধর, সুরম্য বিবিধ নির্জন প্রদেশে, মনোহর নানা পর্বতে এবং রমণীয় বিবিধ সরোবরে, নদ ও নদীর তীরে, ভ্রমর-কোকিলগণের মধুর ধ্বনিতে পরিপূর্ণ সুপুষ্পিত পুষ্পোদ্যানে, রমণীয় পুষ্পশয্যায় সেই রামার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। [কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, অশীতিতম অধ্যায়, ১-২১]

* * *

শঙ্কর তারাকে বলিলেন—তারা! আমি যাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর; তুমি সত্য বল কাহার গর্ভধারণ করিতেছ? যদি চন্দ্র কর্তৃক তোমার গর্ভ হইয়া থাকে তবে তাহা ত্যাগ করিয়া প্রিয়-সন্নিধানে শুদ্ধা হও।— তখন তারা ব্রহ্মাকে "চন্দ্রের কৃত গর্ভ" সহাস্য বদনে এই কথা বলিলে সমুদয় দেবগণ, মুনিসমূহ ও শঙ্কর হাস্য করিলেন। অনন্তর মহাদেব লজ্জিত বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করিলে বৃহস্পতি পতিব্রতা সেই তারাকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং চন্দ্র তারাপ্রসূত কনকপ্রভ পরম-সুন্দর কুমারকে গ্রহণ

পূর্বক ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।"

[শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, একাশীতিতম অধ্যায়, ৫৬-৬২ এর অংশবিশেষ। পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত]

ইহাই যথেষ্ট। ইহা হইতেই এই কাহিনীর স্বরূপ অনুধাবন করা যাইবে। এই কাহিনী মধুসূদনের পক্ষে গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নহে। ইহা কুরুচি ও কদর্যতার উপরে এক নারকীয় কাহিনী। স্বামীপরায়ণা সতী স্ত্রীর শুদ্ধমাত্র দেহ ও যৌবন-লুব্ধতায় তাহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যথেচ্ছভাবে নির্বিচার দেহ-উপভোগ পাশব-প্রবৃত্তি চরিতার্থতা ব্যতীত আর কিছু নহে। মধুসূদনের কাব্যে এই কুরুচি ও কদর্যতার লেশমাত্র নাই, থাকা সম্ভব নয়। সমলোচকগণ মধুসূদন সম্পর্কে যে অভিযোগ করিয়াছেন সেই অভিযোগ মূলকাহিনীর প্রাপ্য, মধুসূদনের নহে।

মধুসূদন পৌরাণিক কাহিনীর ভাষারূপ দান করিতে বসেন নাই, প্রেমিকা-নারীর আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠাকে রূপদান করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহা করিতে হইলে কাহিনীর পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এমন একটি কুরুচিপূর্ণ কাহিনীর পরিবর্তন সাধন ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। মধুসূদনই পুরাণের কদর্যতা হইতে কাহিনীকে মুক্ত করিয়া সুস্থ স্বাভাবিক জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত করেন। রূপান্তরিত-রূপে মধুসূদন যে নারী সৃষ্টি করিলেন বাসনায়-বেদনায় সে নারী চিরন্তনী। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে সেই নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অবরুদ্ধ ছিল, মধুসূদন তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

শাস্ত্রের নির্দেশ বা বন্ধনের দ্বারা হৃদয়মনের সমস্ত আকুলতা ও আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করা যায় না। দেবগুরু বৃহস্পতি যতই শাস্ত্রবিদ হন না কেন সেই শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা নারীর প্রেম-স্বপ্ন চরিতার্থ

করিতে পারেন না। আচার্যের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, হোমবহ্নি-প্রধূমিত তপোবনে একটি উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর বুভুক্ষু অন্তর শূন্যতায় হাহাকার করিয়া ফিরিয়াছে; তাহার দিকে মন দিবার অবসর শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর হয় নাই। তাঁহার বেদনা তাই একাকীত্বের বেদনা।

"জান কি একলা কারে বলে ?
যবে বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই নিতে কেহ নাই"

(জয়সিংহের প্রতি অপর্ণা : বিসর্জন—রবীন্দ্রনাথ।)

তারার হৃদয়ও ছিল পরিপূর্ণ; তিনিও নিজেকে উজাড় করিয়া দিয়া তাঁহার ভালবাসা ও প্রেমকে সার্থক করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার সেই ভরামনের দান ব্যর্থ হইয়া গেল। তাঁহার পরিপূর্ণতার স্বপ্ন সফল হইতে পারিল না। এমন সময়ে মনোহর-কান্তি চন্দ্রের দর্শন পাইলেন। তারার চিত্তজগতে অশান্ত তরঙ্গ-বিক্ষোভ দেখা দিল।

যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নব কুমুদিনী সম এ পরাণ মম
উল্লাসে।

আশ্রমের শান্ত, নির্জনতার মাঝখানে এতদিনের অনাদৃত, অনাঘ্রাত হৃদয় জাগিয়া উঠিল। একাকীত্বের বেদনা হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন। তাই তাঁহার জীবনযৌবন উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার পিছনে রূপসৌন্দর্যের আবেদন অবশ্যই আছে। রূপসৌন্দর্যের সরণী বাহিয়াই তো প্রেমের উদ্‌বোধন। "রূপ আগে পরে ভালবাসা।" এই প্রেম—সমাজ, নীতি, ধর্ম বহির্ভূত হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। ইহা সত্য—বাহ্য সত্যমাত্র নহে, তারার অন্তর্জীবনেরও

সত্য। ইহাকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সজ্ঞানে ইহাকে তিনি অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; প্রেমকে সংগুপ্ত রাখিবার চেষ্টাই তাহার প্রমাণ। নীতি ও ধর্ম আসিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে—মানসিক-দ্বন্দ্বকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই—

হায়রে, কি পাপে, বিধি এ তাপ লিখিলি
এ ভালে? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল?

জীবন-মন্থনে ত কেবল অমৃতই উঠে না, গরলও উদ্‌গীরিত হয়। ইহাই প্রেমের অত্যাগ দহন-জ্বালা। শেষ বিদায়ের দিনে তিনি আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে তাঁহার অন্তর্জীবনই পরিব্যক্ত।

প্রেমে 'প্রসাধনকলা' ও 'সাধনবেগ' দুইই আছে। নিরবচ্ছিন্ন একাকীত্বের মাঝে প্রসাধন-কলার অবকাশ কোথায়? অপরের মনে সৌন্দর্যমায়া রচনা করিবার প্রয়োজন ত তাঁহার ইতিপূর্বে হয় নাই। শান্ত আশ্রমের নির্জনতা হইতে যেদিন প্রথম মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়াছে সেদিন নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রসাধনে, অলংকরণে নিজেকে সজ্জিত করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে—

চির পরিধান মম বাকল; ঘৃণিনু
তাহায়। চাহিনু, কাঁদি বনদেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলী, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে।

ইহাই প্রসাধন-কলা। আবার 'সাধনকলার' পরিচয়ও আছে চন্দ্রের সুখ-বিধানের প্রতি ঐকান্তিক ইচ্ছায়, চন্দ্রের পরিশ্রম লাঘবের চেষ্টায়।

এই তারাই বাঙ্‌লাসাহিত্যের আধুনিক নারীর অগ্রদূতী। সমাজ

ও ব্যক্তির জন্যই আধুনিক জীবনের ইতিবৃত্ত—সেই ইতিবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ তারা-চরিত্র। মধুসূদনের এই নায়িকাই বাঙলা উপন্যাসের বহু স্মরণীয় চরিত্রের পথ-নির্দেশ করিয়াছে।

তারা-পত্রিকার আরও একটি দিক ভাবিয়া দেখিবার আছে। পুরাণে যে কাহিনী বর্ণিত আছে তাহার পরিবর্তন সম্ভব নহে। কাহিনীর পরিণাম স্বীকার করিয়াই মধুসূদন তারার প্রেমজীবনের এক সুন্দর আলেখ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং তাহার ফলে সমগ্র কাহিনীটি কদর্যতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া স্বভাব-সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মূল-কাহিনীর পরিণামের সঙ্গে কবি যে তাঁহার কাহিনীকে সংযুক্ত করিয়াছেন তাহা আমাদের অনুমানমাত্র নহে। মধুসূদনের স্বীকৃতিও আমাদের স্বপক্ষে। মধুসূদন ভূমিকা-অংশে লিখিয়াছেন—'সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন এ স্থানে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই তাহা অবগত আছেন।' মধুসূদনের উক্তি আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। তাছাছাড়া, মূল-কাহিনীর মধ্যেও সন্ধানী-পাঠক সোমের প্রতি তারার অবচেতন-আসক্তি অনুভব করিতে পারিবেন।

(২)

বীরাঙ্গনা কাব্যরচনায় মধুসূদন কাহার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন ? মধুসূদনের চিঠিপত্রের মধ্যে এ প্রসঙ্গে কোন কবির উল্লেখ নাই। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"It is my intention, God willing, to finish this poem in XXI Books. But I must print the XI already finished. The proceeds of the sale of the 1st part must defray the expenses of printing the second. "*Born an age too soon*"—a time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, booksellers, painters *et hoc genus omne* and now I am obliged to sell out."

কাব্যটি একুশটি পত্রিকায় সমাপ্ত করিবার বাসনা মধুসূদনের ছিল। অর্থাৎ বীরাঙ্গনার মূল-পরিকল্পনা অনুসারে ইহা একুশটি পত্রিকার সমবায়। ইতালীয় কাব্য আস্বাদ-কালে বিখ্যাত রোমক-কবি Publius Ovidius Naso (43 B. C.—17 A D)র 'Heroides' কাব্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এই কাব্যেও মোট একুশটি পত্রিকা ছিল। মধুসূদন ওভিদের পত্রিকা-কাব্যের আদর্শ অনুসারে বীরাঙ্গনা-কাব্যের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যাহাই হউক, সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে মিলের কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা কি সম্পূর্ণ যৌক্তিক? একুশটি পত্রে 'বীরাঙ্গনা' সমাপ্ত করিবার বাসনা মধুসূদনের থাকিলেও, ওভিদের অনুসরণের ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। ইহা আমাদের অনুমান মাত্র নহে, উভয়ের পার্থক্য স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করা যায়। ওভিদ ষোড়শতম পত্রিকা হইতে একবিংশতম পত্রিকা ভিন্ন রীতিতে রচনা করিয়াছেন। এই শেষ ছয়টি পত্রিকায় তিনি কেবল নায়িকাকেই নহে, নায়ককেও উপস্থাপিত করিয়াছেন। অর্থাৎ সেখানে তিনজন নায়কের বক্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছে। Acontius এবং Cydippe, Hero এবং Leander, Paris এবং Helen—এই তিনটি যুগ্ম-কবিতায় নায়ক-নায়িকা উভয়ের বক্তব্যই প্রকাশিত। এইরূপ কোন পরিকল্পনা মধুসূদনের ছিল বলিয়া জানা যায় না। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

মধুসূদন দ্বিতীয় পর্বে ছয়টি কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। (১) ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, (২) অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা, (৩) যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, (৪) নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী, (৫) নলের প্রতি দময়ন্তী, [illegible]তি দ্রৌপদী। 'মধুস্মৃতি'-লেখক নগেন্দ্রনাথ সোম এই

সর্বশেষ পত্রিকাটির উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন তিনি দিতে পারেন নাই বা অন্যত্রও তাহা পাওয়া যায় নাই। অবশ্য ইহাদের কোনটিই তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এখন, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের পত্রের একযোগে পত্রসংখ্যা সপ্তদশসংখ্যক। ওভিদের রীতি অনুসরণের ইচ্ছা থাকিলে ষোড়শতম পত্রিকা 'নলের প্রতি দময়ন্তী' না লিখিয়া নল ও দময়ন্তীর পৃথক বক্তব্য প্রকাশ করিতেন। কিন্তু কোথাও তিনি পুরুষের বিবৃতি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং বাহ্যিক পরিকল্পনার দিক হইতে মিল আছে এমন কথা বলা যায় না।

বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয়সূত্র—এই কাব্যের প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র। এই আখ্যা-পত্রে কবি 'সাহিত্যদর্পণ' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন—

"লেখ্য প্রস্থাপনৈঃ নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তি রিষ্যতে।"—সাহিত্যদর্পণং।

দ্বিতীয় সংস্করণেও ইহা ছিল। তৃতীয় সংস্করণ হইতে সাহিত্যদর্পণের উদ্ধৃতিটি তুলিয়া দেওয়া হয়। মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। রুক্মিণীর পত্রের সঙ্গে অবশ্যই তাঁহার পরিচয় ছিল। ভাগবতে রুক্মিণীদেবী এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে দ্বারকানাথের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে দুষ্মন্তকে লিখিত শকুন্তলার একটি অতিক্ষুদ্র পত্রিকা আছে। কালিদাসের বিখ্যাত নাটক "বিক্রমোর্বশীয়ম্" গ্রন্থেও পত্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত পত্রের সহিত মধুসূদনের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু নাট্যগুণ ও কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ এমন কোন পত্রিকা সংস্কৃত সাহিত্যে নাই, যাহা মধুসূদনকে আকৃষ্ট করিতে পারে। পত্রিকারচনার কোন বিশিষ্ট রীতিও সংস্কৃত সাহিত্যে নাই।

দেখা যাইতেছে যে সংস্কৃত সাহিত্য এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আদর্শ উভয়ই মধুসূদনের মনে কার্যকরী ছিল। কিন্তু মধুসূদন

ওভিদকে কতখানি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। পত্রাকারে যে কাব্যরচনা সম্ভব ইহা ওভিদের কাব্য হইতে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবধর্মে ও রূপকর্মে ওভিদের কাব্যের সঙ্গে মধুসূদনের বীরাঙ্গনার কোন যোগ নাই। পত্রিকার উপস্থাপনার ব্যাপারে উভয় কবির সাদৃশ্য আছে মাত্র। ওভিদের আদর্শ অনুসারেই মধুসূদন প্রতিটি পত্রিকার একটি ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।—ক্যানেসের পত্রিকার ভূমিকা —

"Macareus and Canace, son and daughter to Æolus, God of the winds, loved each other incestuously. Canace was delivered of a son and committed him to a Nurse, to be secretly conveyed away. The infant crying out, by that means was discovered to Æolus, who, inraged at the wickedness of his children commanded the Babe to be exposed to wild Beasts on the mountains: And withal, send a sword to Canace, with this message, That her Crimes would instruct her how to use it. With this sword she slew herself. But before she died, she wrote the following letter to her Brother Macareus, who had taken sanctuary in the Temple of Appollo." (ড্রাইডেন কৃত অনুবাদ)

মধুসূদনও পরিচয়জ্ঞাপক একটি বিবৃতি প্রত্যেক পত্রিকার প্রারম্ভে সংযুক্ত করিয়াছেন। পত্রিকা রচনার একটি নাটকীয় মুহূর্ত ওভিদ গ্রহণ করিয়াছেন। 'মধুসূদনের প্রতিটি পত্রিকা নাটকীয় মুহূর্তে লিখিত হইয়াছে। ওভিদ পুরাণের জগতে বিচরণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার কোন গত্যন্তর ছিল না। কারণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ওভিদের সম্মুখে কোন সাহিত্য-সৃষ্টি ছিল না। কিন্তু উনবিংশ

শতাব্দীতে মধুসূদনের সম্মুখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরাট সাহিত্য পড়িয়া ছিল। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার বিশেষ মানসিক-প্রবণতার জন্ত মহাকাব্যের জগতেই বিচরণ করিয়াছেন। ওভিদ কাহিনীর বিবৃতি দিয়া চরিত্রের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দায়িত্ব সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন ইতিহাস বা পুরাণের কাহিনীর বিবরণ দিয়া তাঁহার দায়িত্ব শেষ করেন নাই—তিনি তাহার মধ্যে নিজস্ব মনোভাবকে দ্যোতিত করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

"যৎকালে শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামানুজের মোহনরূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্ন-লিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশমাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকি-বর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।"

('লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা' পত্রিকার ভূমিকা)

মধুসূদনের বক্তব্যে কাহিনী-অংশ একটি বাক্যেই সমাপ্ত হইয়াছে, বাকী সমস্তই মধুসূদনের নিজস্ব মন্তব্য। অবশ্য ইহাকে শুধু মন্তব্য-রূপে দেখিলে চলিবে না। পৌরাণিক নায়িকার অন্তরালে তিনি নবপ্রবুদ্ধ নারীত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বীরাঙ্গনার কোন পত্রিকাই *পুরাণের কাহিনীর বিবৃতি নহে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির* পটভূমিকায় তাহাদের মূল্য উপলব্ধি করিতে হইবে। এ গুরুত্ব ওভিদের কাব্যে নাই।

কাহিনী বা চরিত্রাঙ্কনের দিক হইতে ওভিদের নিকট তাঁহার কোন ঋণ নাই। অবশ্য কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে আপন ভ্রাতার প্রতি প্রণয়াসক্ত ক্যানেস ও সপত্নী-পুত্রের প্রেমে অনুরক্ত

ফেড্রার চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি উর্বশী, সূর্পণখা ও তারা-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। উর্বশী স্বর্বেশ্যা; মধুসূদন তাহার চরিত্রকে প্রেমের ধর্মে উন্নীত করিয়াছেন—সুতরাং উর্বশী সম্পর্কে অভিযোগ অর্থহীন। সূর্পণখা বিধবা। কিন্তু বিধবা হইলেই তাহার স্বপ্ন-কামনার সমাধি হইবে নবযুগের চিন্তাধারায় তাহা স্বীকৃত হয় নাই। বিধবা-বিবাহ যিনি সমর্থন করেন তাহাই নহে, উহাই যাঁহার জীবনের সর্বোত্তম কার্য, সেই বিদ্যাসাগরকে মধুসূদন গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং নবযুগের আকূতির প্রকাশরূপেই পত্রিকাটির বিচার করিতে হইবে।

ওভিদের পত্রিকার আদর্শ এখানে নাই। তারার জীবনের ঘটনার সহিতও কাহারও মিল নাই—ক্যানেস ও ফেড্রার চরিত্র হইতে সে সম্পূর্ণ পৃথক। ক্যানেস আপন সহোদরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে এবং ইহার পরিণাম-স্বরূপ ভ্রাতার ঔরসজাত সন্তানের জননী হয়। পিতা Æolus তাহা জানিতে পারিয়া শিশু সন্তানটিকে পর্বতের উপরে বন্য পশুর সম্মুখে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করেন এবং কন্যার নিকট তরবারি পাঠাইয়া দিয়া আত্মহত্যার নির্দেশ দেন। ক্যানেস মৃত্যুর পূর্বে সহোদর ভ্রাতার নিকট যে পত্রখানি রচনা করেন, তাহা হইতেই তাহার চরিত্র ও মানসিকতা উপলব্ধি করিতে পারি। এই পত্রে সমাজ-ব্যবস্থার উপরে তীব্র কটাক্ষপাত আছে, নিয়তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, পিতার হৃদয়হীনতার জন্য আক্ষেপ আছে, সন্তানের প্রতি কারুণ্য আছে; কিন্তু যে অপ্রতিরোধ্য, অসংবরণীয় আবেগে সে এই দুষ্কার্য করিয়াছে তাহার জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নাই, মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নাই। কোন নৈতিক বিচার তাহার মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু তারা এই শ্রেণীর চরিত্র নহে। স্বামী, স্ত্রীর স্বপ্নকামনা চরিতার্থ করিলে হয়ত তারা এমন করিয়া প্রেমের জন্য প্রলুব্ধ হইত না। নিজ

জীবন-যৌবনকে চন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিতে গিয়াও তাঁহার দ্বিধার অন্ত নাই—তাই তাঁহার আত্মবিচারণা, আত্মধিক্কার ও অনুশোচনা—

জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু? কর্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে?

ফেড্রা স্বামীর মৃত্যুর পর সপত্নীপুত্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। অথচ এই অনুরাগের প্রতিদান পাইবে কিনা সে বিষয়ে ফেড্রার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তথাপি তাহার হৃদয়ের কথা প্রকাশ না করিয়া গত্যন্তর ছিল না। পত্রিকায় নানা যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার করিয়া সে সপত্নীপুত্রকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তারা এই প্রকার কোন চেষ্টা করেন নাই—সমগ্র পত্রিকায় কেবল একবার তিনি প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে!
দেহভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবানিশি!

এই প্রার্থনার সঙ্গে ক্যানেসের অসংবরণীয় আবেগের বা ফেড্রার অকুচিত কামনার মিল সম্পূর্ণ দুর্লক্ষ্য।

সুতরাং প্রচলিত মতবাদের মধ্যে আদৌ কোন যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

ওভিদের পত্রিকাগুলি অনেকাংশে উচ্ছ্বাস-প্রধান। বিখ্যাত ইংরাজ কবি Dryden, 'Heroic Epistles'-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে স্পষ্টতঃ স্বীকার

কহিয়াছেন—"Concerning this work of the epistles, I shall content myself to observe these few particulars. First, that they are generally to be the most perfect piece of Ovid, and that the style of their to be the most tenderly *passionate* and courtly". কিন্তু মধুসূদনের কাব্য কেবল উচ্ছ্বাস-প্রধান নহে ; গীতি, নাটক ও আখ্যানের সমবায়ে এক বিচিত্র রীতিতে তাহা রচিত। ওভিদের রচনার সহিত মধুসূদনের রচনার তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ নাই ; কেবল উভয়ের পার্থক্য অনুধাবনের জন্য দু'একটি অংশ উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইল। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ আসক্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা সমগোত্রীয়তা অনুভূত হইবে বলিয়া ক্যানেস ও তারার পত্রিকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

"Why did thy flames beyond a Brother's move ?
Why lov'd I thee with more than Sister's love ?
For I lov'd too, and, knowing not my wound,
A secret pleasure in thy kisses found.
My Food grew loathsom, and my strength, I lost:
Still e're I spoke, a sigh wou'd stop my tongue.
Short were my slumbers, and my Nights were long.
I knew not from my love these Griefs did grow,
Yet was, alas, the thing I did not know
My wily Nurse, by long Experience found,
And fitst discover'd to my soul to its wound......
But now my swelling womb heav'd up my breast
And rising weight my sinking limbs opprest
What Herbs, what plants, did not my Nurse produce,
To make abortion by their powerful juice ?"

[ড্রাইডেন কৃত অনুবাদ]

ইহার সহিত তারা-পত্রিকার যে কোন অংশ উদ্ধৃত করিলেই পার্থক্য প্রতীয়মান হইবে।

ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে!
ঢাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি,
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে!

অথবা

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!

ওভিদের কোন কোন পত্রিকার অংশবিশেষ অবশ্যই সুন্দর। হেলেন যেভাবে পত্রিকা সমাপ্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

Be Rul'd by me, and Time may be your Friend
This is enough to let you understand ;
For now my pen has tir'd my tender Hand ;
My woman knows the secret of my heart,
And may here after better news impart.

[ড্রাইডেন কৃত অনুবাদ]

তথাপি তাঁহার উগ্র অহংতান্ত্রিকতা ব্যক্তি-স্বরূপ প্রকাশের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ মধুসূদনের পত্রিকাগুলিতে নারীচরিত্রের এক একটি বিশিষ্ট প্রেরণার আলোকেই তাঁহাদের অন্তর-জীবন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনের পত্রিকায় মূলতঃ একটি

ভাবেরই অভিপ্রকাশ ; তাহা নানা বিরোধী ও বিচিত্র ভাবের সন্নিবেশে জটিলতা প্রাপ্ত হয় নাই সত্য, কিন্তু অন্তরজীবনের বাণী-বহনে, মনোজীবনের বিচিত্র স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে এবং সর্বোপরি মানবিক চেতনার বিস্ময়কর রূপায়ণে অনন্যসাধারণ রূপমূর্তি লাভ করিয়াছে। চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে এইখানেই মধুসূদনের অনন্যতা।

ওভিদের কোনো কোনো চরিত্র সাধারণভাবে এক একটি গুণের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পেনিলোপে বিশ্বস্ততা, ব্রেবিসে ক্ষমা, দিদোয় বেদনা, হেলেনে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইয়াছে। নানা বিরুদ্ধ ভাবের প্রতিক্রিয়ায়, সমাজ ও ব্যক্তিমানসের দ্বন্দ্বে তাহা আকীর্ণ নহে ; অন্তর্জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে, সুখে-দুঃখে-ভালোয়-মন্দয় মিশ্রিত মানব-মানবী এই কয়টি পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে নাই। তাই কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্য সমালোচক ওভিদের কাব্যে মানবীয়তার অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।

Medea, Hypsipyle, Oenone, Ariadne ইত্যাদি চরিত্রে ভাবাবেগ প্রবল, কিন্তু এই ভাবাবেগ কতখানি বাস্তবভিত্তিক তাহাও দেখা দরকার। এই ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া পাশ্চাত্ত্য সমালোচক ব্যর্থ হইয়াছেন। ওভিদ তিনটি যুগ্মকবিতা রচনা করিয়াছেন—Acontius ও Cydippe, Hero ও Leander, Paris ও Helen. এই কয়টি পত্রিকায় ওভিদ একটি স্বতন্ত্র রীতি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ঐ তিনটি যুগ্ম-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা কাহিনীর বিচিত্র গল্পরস উপভোগ করি মাত্র, তাহার অধিক কিছু নহে। অবশ্য কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ যুগ্ম-কবিতা তিনটি ওভিদের রচনা নহে, উহা পরবর্তী কালের সংযোজনা।

Laddamia, Plythis, Canace চরিত্র অবশ্যই বাস্তবজীবনের

উষ্ণ স্পর্শ লাভ করিয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের চরিত্র হইতে তাহাদের পার্থক্য দুস্তর।

ওভিদের সহিত মধুসূদনের মৌলিক পার্থক্য রচনারীতিতে—আঙ্গিকে। ওভিদের কোন কোন পত্রিকায় একটি ভাবের তরঙ্গ-স্বনিত আবেগ-প্রবাহ আছে সত্য কথা, কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আখ্যানভাগের অপূর্বতার সহিত নাটকীয় সংলাপ অন্তরশায়ী এক লিরিক চেতনার ফল্গুস্রোতে মিশিয়া অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(১০)

বীরাঙ্গনা কাব্যের পত্রিকা-বিশ্লেষণে কোন কোন সমালোচক ইহাদের পর্যায় অনুসারে আলোচনা করিয়াছেন। প্রেম পত্রিকা, স্মরণার্থ পত্রিকা, প্রত্যাখ্যান পত্রিকা ও অনুযোগ পত্রিকা—এইরূপ চারিটি বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে বিভাগ কল্পনা করা হইয়া থাকে; অবশ্য সেই সকল ক্ষেত্রে সেই ধরণের বিভাগ কল্পনার একটা যৌক্তিকতা থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রে সে সুযোগ নাই এবং ঐ প্রকার বিভাগ বা পর্যায় কল্পনা অসঙ্গত। তারা, শূর্পণখা, রুক্মিণী ও উর্বশীর পত্রকে প্রেমপত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু শকুন্তলা, দ্রৌপদী ভানুমতী এবং বীরাঙ্গনার তাবৎ নারীর পত্রিকা কি প্রণয় পত্রিকা নহে? আবার স্মরণার্থ পত্রিকা বলিয়া যে বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্র। বীরাঙ্গনার পত্রিকাগুলির মধ্যে এই চারজন নায়িকাই কি তাঁহাদের স্বামীগণকে অথবা দয়িতকে স্মরণ করিয়াছেন, অপর কেহ করেন নাই? প্রত্যেক নায়িকাই তাঁহাদের নায়কের নিকট পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদেরকে স্মরণ করিয়াই। সুতরাং এবম্প্রকার পর্যায় বিভাগ

অবান্তর হইয়া পড়ে। আবার জনা পত্রিকাকে অনুযোগ পত্রিকা বলিলে সবটুকু বলা হয় না। একাদশটি পত্রিকার মধ্যে কমবেশী প্রত্যেক পত্রেই অনুযোগ আছে; শুদ্ধমাত্র জনা পত্রিকাকে অনুযোগ পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার যৌক্তিকতা কি? জাহ্নবী দেবীর পত্রিকাকে সেইরূপ প্রত্যাখ্যান পত্রিকা বলিলে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। পর্যায়-বিভাগের এই দুর্বলতা বুঝিতে পারিয়া কেহ কেহ বীর ও প্রণয়—এই দুই ভাগে ভাগ করিবার পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, ইহাও গ্রহণযোগ্য নহে। মধুসূদনের প্রেম বীর্যবিহীন নহে। সুতরাং বীর ও প্রণয় বিভাগ কল্পনাও অসঙ্গত।

বস্তুতঃ প্রতিটি চরিত্র পৃথক, আপন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত ও সমুজ্জ্বল। নারী চরিত্রের অনন্ত রহস্য ও বৈচিত্র্য প্রকাশে মধুসূদনের ভূমিকা অনন্য-সাধারণ। মধুসূদন যে একাদশটি নারী চরিত্র উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রেমময়ী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বয়োধর্ম, চারিত্রিক প্রবণতার ফলে একই প্রেমের মধ্যে যে কত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, মধুসূদন তাহা অসাধারণ শিল্প-কুশলতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। বাহ্যরূপে নারীর সামান্যতঃ তিন অবস্থা—কুমারী, সধবা ও বিধবা। কুমারী জীবনে প্রেমের রোম্যান্টিক-আবেগ প্রাধান্য পায়; প্রেমের শুচিস্নিগ্ধ তপোজ্যোতি বিরাজ করে। কুমারী-হৃদয় সাধারণতঃ দ্বন্দ্ব-সমাকুল নহে; একের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিয়া সে ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চাহে। কুমারীর প্রেম সৌন্দর্যময়, আত্মিক আনন্দের সৌরভে পরিপূর্ণ—ভোগবাসনার দ্বারা তাহা মলিন নহে, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে তাহা আকীর্ণ নহে। প্রেমের একনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী মধুসূদন তাই এমনি একটি কুমারী-চরিত্র গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি রুক্মিণী।

ভাগবতে বাস্তবিকই রুক্মিণীদেবী এক ব্রাহ্মণের মারফতে দ্বারকা-নাথের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রের সঙ্গে মধুসূদনের

পরিচয় ছিল। ভাগবতের পত্র অবশ্যই সুন্দর ; কিন্তু মধুসূদনের পত্রিকা সম্পূর্ণাঙ্গ, সুন্দরতর। অনুরাগে-লজ্জায়, দ্বিধায়-শরমে কুণ্ঠিত কিশোরীর বিনম্র-চিত্তের আকৃতি এক আশ্চর্য আলোছায়ায় বিরঞ্জিত।

কুমারী প্রেমের মধ্যে প্রেমের রোম্যান্টিক অনুভূতি খুব সঙ্গতভাবে কবি প্রকাশ করিয়াছেন। কুমারী-জীবন অপেক্ষা সধবা-জীবনে জটিলতার অবকাশ অধিক। যেখানে প্রেম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, সামাজিক বন্ধনের মধ্যে অন্বিত, সেখানে কোন জটিলতা বা সমস্যা নাই। কিন্তু নারী যেখানে একের স্ত্রী হইয়া ভালবাসার আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় এবং অপরের প্রতি অনুরাগ অন্তরে পোষণ করে—এবং সেই অনুরাগ যেখানে শুধু দেহচেতনা-সমুত্থ নহে, অন্তর-সত্য, সেখানে সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। সধবা জীবনের সম্ভাব্য বিভিন্ন অবস্থা ও সমস্যাকে মধুসূদন বিভিন্ন নায়িকার মধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন।

বিবাহ-রজনীর শুধুমাত্র সুখস্মৃতি অবলম্বন করিয়া শকুন্তলার স্বামীপ্রেম প্রকাশিত হইয়াছে। স্মৃতিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। একটি দিনের স্মৃতিকেই তিনি সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। সরলা ঋষিবালিকা একদা প্রেমের বিচিত্র বারতার সন্ধান পাইয়াছিল, তাঁহার দেহমন-আত্মা কৃতার্থ হইয়াছিল—তাহার পর সব শেষ হইয়া গিয়াছে ; আছে শুধু স্মৃতির বিচিত্র বেদনা ও পুলক। স্মৃতিময় জগতেই তাই তাঁহার মানস-পরিক্রমা

দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ ; চারিদিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।***

কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,

নরেন্দ্র ; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা। পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লেখি নিত্য কব তা' কেমনে ?

একটি দিনের প্রতিটি ঘটনাকে তিনি স্মৃতির মুকুরে প্রতিফলিত করিয়া প্রেমের ধ্যানে মগ্ন, রতি হইতে আরতিতে উত্তীর্ণ।

আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্যতলে।

শকুন্তলা চিরজাগ্রত, উন্মুখমুখর স্বপ্নমুখী।

শকুন্তলা বিবাহিতা, তথাপি সেই বিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি পায় নাই। সামাজিক স্বীকৃতি বীরাঙ্গনার নায়িকাদের ক্ষেত্রে বড় কথা নহে—আপন হৃদয়মন ব্যতীত আর কাহারও পারবশ্য তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের বিকাশ, সেই দয়িতের অন্তর-স্বীকৃতি না পাইলে সমস্তই যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে! সেইজন্যই শকুন্তলার চিত্ত আশা-আশঙ্কার আলোছায়ায় কম্পমান। 'হেথা সুখ গেলে স্মৃতি একাকিনী বসি' ফেলে দীর্ঘশ্বাস।'

এই শকুন্তলা মধুসূদনের নিজস্ব সৃষ্টি। ব্যাস, কালিদাসের শকুন্তলা হইতে সে স্বতন্ত্র। কালিদাসের শকুন্তলা প্রকৃতির সহিত নিবিড় আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ। এক কথায়, শকুন্তলা প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত। মধুসূদনের দৃষ্টিতে শকুন্তলার মানবীয় দিকটিই অসাধারণ কাব্যচমৎকৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই ব্রীড়াকুণ্ঠিতা, আত্মবিস্মৃতা শকুন্তলা এখানে প্রেমের উপলব্ধিতে আত্মপ্রত্যয়িনী। প্রকৃতি প্রিয়মিলনের স্মৃতি বহন করে বলিয়াই শকুন্তলার নিকট তাহার মূল্য ও মর্যাদা। ব্যক্তিজীবনের আলোকেই তিনি প্রকৃতিকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত প্রেম সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া প্রকৃতির রাজ্যে যেখানে প্রেমের গুঞ্জরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অর্থহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-সুধা?
কহি পিকে, 'কেন তুমি, পিককুলপতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?...'

প্রকৃতি এখানে মানবের বিরহমিলনের পটভূমিকা রূপেই উপস্থিত হইয়াছে। এইখানেই তাহার সীমা ও সিদ্ধি।

শকুন্তলার মনে যে ঐশ্বর্যছবি কবি অঙ্কন করিয়াছেন কোন সমালোচকের নিকট তাহা অযথার্থ বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহা অগভীর উক্তি। মূল ব্যাস মহাভারতের কাহিনী মনে রাখিলে ঐশ্বর্য-ছবি সন্নিবেশের মর্মার্থ অনুধাবন করা যাইবে।

জগ্রাহ বিধিবৎ পাণাবুবাস চ তয়া সহ।
বিশ্বাস্য চৈনাং স প্রায়াদব্রবীচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
প্রেষয়িষ্যে তবার্থায় বাহিনীং চতুরঙ্গিণীম্।
তয়া ত্বাং নায়য়িষ্যামি নিবাসং স্বং শুচিস্মিতে॥
[সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়; ২৬-২৭, আদিপর্বণি]

এবং আরও—

সুবর্ণমালাং বাসাংসি কুণ্ডলে পরিহাটকে।
নানাপত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নে চ শোভনে॥

আহরামি তবাস্থাহং নিষ্কান্ জিনানি চ।
সর্ব্বং রাজ্যং তবাদ্যাস্তু ভার্যা মে ভব শোভনে॥

[ঐ, ১-৩, আদিপর্ব্বণি]

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে রাজ-ঐশ্বর্যের যে প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, সরলা ঋষি-বালিকার মনে তাহার প্রতিক্রিয়া জাগিবে ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহার অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের মধ্যে একেবারে অনাবৃতরূপে ধরা দিয়াছে। সুতরাং স্বপ্নঘোরে ঐ ঐশ্বর্যচিত্র অর্থহীন নহে, তাঁহার চরিত্রের সহিত অসমঞ্জস নহে। বস্তুতঃ ঐশ্বর্যের পদতলে শকুন্তলা আত্মবিক্রয় করে নাই, প্রেমের দীপ্যমান দীপশিখায় আপন অন্তরলোক আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই পত্রিকা সম্পর্কে আরও একটি কথা বলিবার আছে। পত্রিকার অন্তিম চরণটি স্মর্তব্য—'জীবনের আশা হায়, কে ত্যজে সহজে।' জীবনের প্রতি নিঃসীম ভালবাসাই ইহার মধ্য দিয়া দ্যোতিত হইয়াছে। পারলৌকিকতার কল্পিত সুখস্বর্গ হইতে এই মাটির পৃথিবীর সুখস্বপ্ন অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে হইয়াছে।

শকুন্তলায় যদি প্রেমের পূর্বরাগ, দ্রৌপদীতে পূর্ণরাগ। শকুন্তলা ব্রীড়াকুণ্ঠিত, দ্রৌপদী প্রদীপ্ত। দ্রৌপদী মহাভারতের এক বিস্ময়কর চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দ্রৌপদী প্রবন্ধে সীতার সহিত তাঁহার মৌল পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণগুলিও পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত।...সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদী হরণে আসিতেন, তবে বোধহয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায় দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।'

এহেন নারী চরিত্র মধুসূদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—ইহা একান্ত স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

'রূপের মোহ হইতে বীর্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জুনে অধিকতর অনুরক্তা করিয়া তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণ পথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন।'

ব্যাস-মহাভারতে অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর মনোভাব বিভিন্নস্থানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। স্বয়ং দ্রৌপদী বলিয়াছে—

বিশেষতস্তু পাঞ্চালী স্মরন্তী মধ্যমং পতিম্।
উদ্বিগ্নং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমিদং বচনমব্রবীৎ॥
যোঽর্জ্জুনেনার্জ্জুনস্তুল্যো দ্বিবাহুর্বহুবাহুনা।
তমৃতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং বনং ন প্রতিভাতি মে॥
শূন্যামিব চ পশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্।

পঞ্চস্বামী সত্ত্বেও অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর অতন্দ্র ভালবাসার ইঙ্গিতটি কবি গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিচিত্র ভাবে ও রসে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

শকুন্তলার ন্যায় দ্রৌপদীও সধবা এবং প্রোষিতভর্তৃকা। কিন্তু শকুন্তলার সহিত তাঁহার দুস্তর ব্যবধান। একটি দিনের মিলনের স্মৃতি-সৌরভে সমাকুল-চিত্ত শকুন্তলা আর প্রণয়ের বিস্তৃত পটভূমিকায় তাৎকালিক বিরহে দ্রৌপদী ব্যাকুলা। ক্ষণমিলন চিরমিলনে পর্যবসিত হইবে কিনা তাহারই আশা-আশঙ্কায় শকুন্তলার হৃদয় মেঘ-মেদুর আর সহধর্মিণীর যোগ্য অধিকারে দ্রৌপদীর মান-অভিমানের আলো-ছায়ার নৃত্যলীলা। শকুন্তলা দুষ্মন্তের বহুবল্লবতার প্রতি ইঙ্গিত করিতে পারে নাই, সে যোগ্যতা ও অধিকার তাঁহার ছিল না। কিন্তু দ্রৌপদী সে

অধিকারে অধিকারিণী বলিয়া তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বাণে তিনি স্বামীকে বিদ্ধ করিয়াছেন—

শতফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা ?

দ্রৌপদীর পত্নীত্বের অধিকারও যতখানি সত্য, তাহার প্রেমও ততখানি সত্য। শকুন্তলার প্রেমও সত্য কিন্তু অধিকারের অভাবে তিনি প্রেমকে আত্মঘোষণার স্তরে লইয়া যাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ শকুন্তলার চরিত্রই ভিন্ন প্রকার। দ্রৌপদী বলিয়াছেন—

পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।

এই মনের মানাকেই বীরাঙ্গনার নারীগণ চূড়ান্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন—ইহাই প্রেমের বীর্যে আত্মঘোষণা। তাই দ্রৌপদী স্বামীকে পারিজাত আনিবার কথা বলিয়াছেন, এমনকি পত্রের উত্তর না দিয়া স্বয়ং চলিয়া আসিবার দাবী জানাইয়াছেন।

কি কহিনু, নরোত্তম ? কি কাজ উত্তরে ?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে।

ইহা অনুরোধ, না আদেশ ? এই আত্মনির্ভরতা শকুন্তলা পাইবে কোথায় ?

চরিত্র, পরিবেশ, অবস্থা সমস্তই উপরোক্ত দুইজন নায়িকার ক্ষেত্রে পৃথক—সুতরাং তাঁহাদের চিত্র-চরিত্রে পার্থক্য স্বাভাবিক। কিন্তু দ্রৌপদীর সহিত বাহ্যতঃ ভানুমতীর পার্থক্য দুস্তর নহে। দুইজনেই ক্ষত্রিয় রমণী। অথচ ভাবনায়, চিন্তায় ইহাদের মধ্যে কত পার্থক্য! ভানু-মতী-পত্রিকায়—ভাবী-দুর্যোগের ধূসর-পটভূমিকায় স্বামীর অকল্যাণের দুশ্চিন্তায় বিহ্বলচিত্ত এক নারী হৃদয়ের নিরাবরণ অভিপ্রকাশ ঘটিয়াছে। সমস্ত কৌরবকুলের কাতর ক্রন্দনের সঙ্গে তিনি নিজ হৃদয়ের বেদনাকে

মিশাইয়া দিয়াছেন   তিনি কৌরবকুলের রাজমহিষী ; শুধু স্বামী নহে, রাজ্যের শুভাশুভের প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য। স্বামী-প্রেম ও রাজ্যের কল্যাণ—তাঁহার কাছে বিরোধী বস্তু নহে। তিনি সমগ্রভাবেই ইহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মধুসূদন এখানে প্রেমকে ব্যক্তিসীমার ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়া কল্যাণের সহিত, সমগ্রের সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যক্তিপ্রেমই যদি এখানে প্রাধান্য লাভ করিত তাহা হইলে কেবল স্বামীর অশুভ, অমঙ্গল চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। তাঁহার পক্ষে কৌরবকুলের বেদনা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইত না। এমন কি স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী হইয়াও তাঁহার অনুচিত কার্যের সমালোচনা করিতে পারিতেন না।

নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী
কাঁদে কুরু-বধূ যত। কাঁদে উচ্চরবে
মায়ের আঁচল ধরি কুরু-কুল শিশু
তিতি অশ্রু-নীরে, হায়, না জানি কি হেতু।

সমগ্র পরিবারের এই বেদনা-প্রকাশ অর্থহীন নহে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দুর্যোধন শুধু তাঁহার স্বামীই নহেন, তিনি রাজা। সুতরাং ঐ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া স্বামীকে সামগ্রিক বিনিষ্ট হইতে তিনি রক্ষা করিবার আবেদন জানাইয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের জন্য তাঁহার স্বামীর দায়িত্ব যতই থাকুক, স্ত্রী হইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ আনিতে পারেন নাই ; তাই তিনি শকুনির স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভানুমতী চরিত্রের অপর বৈশিষ্ট্য ধর্মবোধ। রবীন্দ্রনাথ বহু পরে গান্ধারী চরিত্রের মধ্যে যে ধর্মবোধ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, তাহার সূত্র-সঙ্কেত রহিয়াছে মধুসূদনের ভানুমতীর পত্রিকার মধ্যে।

গঙ্গাজল পূর্ণ ঘটে, হায় ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্মনাশা জলে ?

ভানুমতী তাঁহার পত্রিকার শেষ অংশেও কেবল নিজের কথা নহে, সকলের মঙ্গলের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তোষ পঞ্চজনে ;
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে ; তোষ অভাগীরে—
রক্ষ কুরু-কুল, ওহে কুরুকুলমণি !

ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার ধর্মবোধ যেমন প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ পিতামাতা, কৌরবকুল ও পত্নীর প্রতি দুর্যোধনের দায়িত্বের কথাও অভিব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার ব্যক্তিগত প্রেমের গভীরতাও কম নহে। প্রিয়তম পতিকে হারাইবার আশঙ্কা স্বপ্নঘোরে এক চূড়ান্ত রূপ ধারণ করিয়াছে। তাঁহার আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ এবং চঞ্চলচিত্ততার মধ্যে প্রেমই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্যান্য নায়িকার ন্যায় তিনি প্রেমের কথা বাহিরে প্রকাশ করেন নাই এবং তাহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইয়াছে।

দুঃশলা ঠিক একই অবস্থায় স্বামীকে পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের কবিদৃষ্টি ইহাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। মধুসূদনের দৃষ্টি কত গভীর ও নিখুঁত তাহার একটি প্রমাণ উদ্ধারযোগ্য। ভানুমতী ও দুঃশলা কৌরবকুলের বধূ ও কন্যা। বধূর পক্ষে সকলের সম্মুখে বাহির হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু কন্যার ক্ষেত্রে সে বাধা নাই। তাই ভানুমতী যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করেন স্তম্ভের আড়ালে।

স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা।

কিন্তু দুঃশলা সকলের মাঝখানে বসিয়াই যুদ্ধের বার্তা শ্রবণ করেন।

মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্তা।

ভানুমতী বা দুঃশলা কাহারও পত্রে প্রেমের ললিত গুঞ্জরণ নাই। যে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখে তাঁহারা পত্রিকা রচনা করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় প্রেমালাপন অসম্ভব। দুঃশলার পত্র তাঁহার জীবনের এক পরম সন্ধি-লগ্নে লিখিত—তাই সমাগত বৈধব্যের ভীতিকাতর শোকোচ্ছ্বাস ইহার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজিকার নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেমময় জীবনের অবসান, তাঁহার সুচিরবাঞ্ছিত যৌবন-আকাঙ্ক্ষার সমাধি। ভানুমতীর বৈধব্য-চিন্তার সহিত ইহার দুস্তর ব্যবধান। ভানুমতীর ভীতি অনেকাংশে মনঃকল্পিত। তাঁহার কল্পিত, অশুভ চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়াছে স্বপ্নের মধ্য দিয়া; তাহার বাস্তব ভিত্তি নাই। প্রিয়জন সম্পর্কে নারী-হৃদয়ে স্বভাবতই যে অশুভ-আশঙ্কা দেখা দেয়, উহা তাহারই বহিঃ প্রকাশ।

কিন্তু দুঃশলার নিজেকে সান্ত্বনা দিবার কিছু নাই। কারণ তিনি জানেন পার্থের প্রতিজ্ঞা বিফল হইবার নহে। তাই এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন।

অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু।

এইরকম এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে কৌরবকুলের দুঃখবেদনা তাঁহার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই। তিনি আপন অন্তরজীবনের নিঃসীম শূন্যতায় পতি ও পুত্রের চিন্তাতেই মগ্ন। তাহা ছাড়া তিনি কৌরবকুলের কন্যা, বধূ নহেন—রাজ্যের শুভাশুভের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তাই তিনি পাপ রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া

যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, প্রেমের কুসুমাস্তীর্ণ এক স্বপ্নময় সৌন্দর্যচ্ছবি তিনি রচনা করিয়াছেন। কাল রাত্রি-প্রভাতে, যাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান, তাঁহার বেদনার কালিমা গাঢ়তর করিবার জন্য কবি এক অপরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !

এমন নাটকীয় বৈপরীত্য সৃষ্টি অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতার নির্ভুল স্বাক্ষর। অবশ্য চরিত্রবিচারের দিক হইতে এই সকল চরিত্র একমুখী। যুগজীবনের জটিলতার চাপ তাঁহাদের চিত্তে দ্বন্দ্ব-অভিঘাতের সৃষ্টি করে নাই। সেই নূতন যুগ তারার পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পূর্ববর্তী অংশে বিশদ আলোচনার দ্বারা মধুসূদনের এই অসামান্য সৃষ্টির কিছু পরিচয় প্রদানের চেষ্টা আমরা করিয়াছি।

কৈকেয়ী, জনা এবং জাহ্নবী তিনজনেই সধবা, কিন্তু তাঁহাদের এমন বিশিষ্ট ভূমিকা যে কেবল সধবা রূপে অথবা অলঙ্কার-নির্দিষ্ট কোন প্রকার নায়িকার আদর্শে তাঁহাদের বিচার চলিবে না। অলঙ্কার-শাস্ত্র যে সীমাবদ্ধ, তাহার দ্বারা যে জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, মধুসূদন তাহা ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

রামায়ণের কাহিনী অনুসারে দশরথ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিলে কৈকেয়ী অভিমান করিয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করেন।

ক্রোধাগারে চ পতিতা সা বভৌ মলিনাম্বরা ॥
একবেণীং দৃঢ়াং বদ্ধা গতসত্ত্বেব কিন্নরী।
আজ্ঞাপ্য তু মহারাজ্ঞো রাঘবস্যাভিষেচনম্ ॥

রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে দেখিতে না পাইয়া কামার্ত হইয়া পড়েন এবং প্রতিহারীর নিকট সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। মন্মথশর-বিদ্ধ রাজা কৈকেয়ীকে বরদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধে দশরথের দেহ ক্ষত হইলে কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া একটি বরদানের প্রতিশ্রুতি দান করেন এবং দ্বিতীয়বার মুখ-ব্রণে কাতর হইলে কৈকেয়ী সেবার দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তিনি দ্বিতীয় বরদানের প্রতিজ্ঞা করেন।

রাজার নিকট বরদানের পূর্ব-প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তিনি সর্বদেবতা, চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্রকে সেই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিতে বলিলেন। মধুসূদন এই সূত্র-সঙ্কেতটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কৈকেয়ী দেশদেশান্তরে, পথিক, গৃহস্থ, রাজা ও কাঙাল—সকলকে ও সবস্থানে রাজা দশরথের অধর্মের কথা প্রচার করিবেন বলিয়াছেন। ইহার সূত্র-সঙ্কেত হিসাবে মূল রামায়ণের অংশটি উদ্ধারযোগ্য।

চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহরাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্ব্বা সরাক্ষসা ॥
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব ॥
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ ॥

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কৈকেয়ী ধর্মের কথা অত্যন্ত জোরের সহিত বার বার ঘোষণা করিয়াছেন। এই সূত্র-সঙ্কেতটিও মধুসূদন মূল রামায়ণ হইতে

পাইয়া থাকিবেন। কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার কথা শুনিয়া শোকে অভিভূত রাজা অন্য বর প্রার্থনার কথা বলিলে কৈকেয়ী বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

যদি দত্ত্বা বরৌ রাজন্ পুনঃ প্রত্যানুতপ্যসে।
ধার্ম্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি॥
যদা সমেতা বহবস্ত্বয়া রাজর্ষয়ঃ সহ।
কথয়িষ্যন্তি ধর্ম্মজ্ঞ তত্র কিং প্রতিবক্ষ্যসি॥

সত্যপালনের মহত্ত্ব সম্পর্কে কৈকেয়ীর ধারণাও লক্ষণীয়—

আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো জনাঃ।
সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্ম্মং প্রতি চোদিতঃ॥
* * *
সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্॥
সত্যং সমনুবর্ত্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ।
স বরঃ সফলো মেঽস্তু বরদো হ্যসি সত্তম্॥

মূল রামায়ণের মধ্যেই মধুসূদন কৈকেয়ী চরিত্রের বীজ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। মধুসূদন কৈকেয়ীকে ক্রোধাগারে না পাঠাইয়া এই নাটকীয় মুহূর্তটিকে পত্ররচনার উপযুক্ত অবসর-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কৈকেয়ী যাঁহার নিকট পত্র লিখিতেছেন তিনি কেবলমাত্র স্বামী নহেন, রাজ্যের অধিকর্তা। সত্যরক্ষা, ধর্মরক্ষা রাজার কর্তব্য। নিজ পুত্রের রাজ্যলাভের নারীজনোচিত কামনা ইহার মধ্যে থাকিলেও, ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হইয়াছে। দশরথের মোহভঙ্গের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা, অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁহার দ্বিধাহীন উচ্চকণ্ঠ লক্ষণীয়। সত্য ও ধর্মের দিকে তাকাইয়া এমন বিদ্রোহ সম্পূর্ণ অভিনব—এমনকি একালের পক্ষেও। 'Born an age too soon'—মধুকবির এ উক্তি অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় যে ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য নিষ্ঠা ও

তেজ প্রকাশ করিতে গিয়া মধুসূদন চরিত্রটি অমানবীয় করিয়া তুলেন নাই।

কৈকেয়ীর পত্রিকাটি ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তাঁহার অভিযোগ ছাড়াইয়া ব্যক্তি-হৃদয়ের হাহাকারই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। যৌবন ও সৌন্দর্যের প্রতি নরনারীর আকর্ষণ স্বাভাবিক। বিশেষতঃ নারী তাহার যৌবন ও সৌন্দর্যের পশরা সাজাইয়া পুরুষের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নারী তাহার সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্য দিয়াই পরিতৃপ্ত। কিন্তু যৌবন যখন চলিয়া যায়, স্বামীর নিকট হইতে যখন আর পূর্বের ন্যায় অনুরাগ-সিঞ্চিত ভাষা স্ত্রী শুনিতে পায় না তখন বেদনা অনুভব না করিয়া পারে না। কৈকেয়ী-পত্রিকার মধ্যে সমস্ত কিছুকে ছাপাইয়া তাঁহার বিগত যৌবনের জন্য ব্যাকুল বেদনা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অতীতের দিকে তাই তিনি বারংবার সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন।

না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে!
নহে গুরু-উরু-দ্বয়, বর্তুল-কদলী
সদৃশ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ! সুধা-হীন অধর! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি নীরসি কুসুমে!

এই অপগত যৌবন-বেদনাই প্রধান। প্রিয়া হইয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য আর তাঁহার নাই। অথচ একদিন ছিল—সেই একদিনের দিকে বার বার সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ। নারীর

প্রিয়া-রূপের অবসান ঘটিলে জননীরূপের মধ্যে নিজ আসন পাতিয়া লয়। ইহাই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কৈকেয়ীর নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একমাত্র রহিয়াছে জননীত্ব। তিনি শুধু ভরতের মাতা—শুধু ইহার দ্বারা তাঁহার জননী-রূপ প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভরত রাজা হইলে তবেই তিনি রাজমাতা হইবেন। তাই পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য তাঁহার আত্যন্তিক প্রচেষ্টা।

কৈকেয়ীকে যদিবা অলংকার-শাস্ত্রোক্ত নায়িকার পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়, জাহ্নবীদেবীর ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনাও নাই। এমন এক চরিত্র সৃষ্টি দুঃসাহসেরই পরিচয় বহন করে। ইহাতে পূর্বরাগের কোন চিত্র নাই, মান-অভিমানের কোন অবকাশ নাই, এমন কি বিচ্ছেদের বেদনাও বুঝি বা বাজে নাই। করুণার বশবর্তী হইয়া তিনি মর্ত্য-মানবীর রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেম অপেক্ষা কর্তব্য ও করুণাই তাঁহার নিকট বড় ছিল। তাই কর্তব্য-অন্তে তিনি রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। জাহ্নবীর প্রেম প্রকাশমুখর নহে, অন্তরগভীর। প্রেমের মুখরতার দ্বারা তিনি স্বামীর হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে চাহেন নাই, প্রেমের গভীরতায় সান্ত্বনা-মাধুর্যে স্বামীর হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের মনেও আছে অপ্রকাশের বেদনা। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপের' কচের কথা স্মরণ করিতে বলি। শেষ-বিদায়ের দিনে কচের মনেও কি কোন বেদনা জাগে নাই ?

"আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব ?"

[বিদায়-অভিশাপ—রবীন্দ্রনাথ]

কচের কাছেও প্রেম অপেক্ষা কর্তব্য বড় ছিল। কচ আপনার হৃদয়কে

দেবযানীর নিকট মেলিয়া দেয় নাই, আর জাহ্নবী দেবী হৃদয়কে সংগোপন করিয়া রাখিয়াছেন। স্বামীর প্রতি সহানুভূতি ও আন্তরিকতার অভাব তাঁহার ছিল না। 'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে'—একথা তিনি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। শান্তনুকে ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই তিনি এই আঘাত তাঁহাকে দিয়াছেন। রাজাকে ত্যাগ করিয়া আসিতেই হইবে—ইহা পরমতম সত্য। কিন্তু তিনি যদি স্বামীর মনে আসক্তি আরও নিবিড়ভাবে গ্রথিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে রাজা নিজেকে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিতেন। তাই পত্রিকারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—

বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব কথা—

এবং শেষাংশে—

যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গ রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য সুখে!

রাজাকে সুখী দেখিবার এই ঐকান্তিক কামনার মধ্যে জাহ্নবীর কোন্ চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে? নিজের হৃদয়কে যতই তিনি গোপন করিতে চেষ্টা করুন না কেন, সর্বত্র সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। প্রত্যাখ্যানের মেঘান্ধতার মধ্যে প্রীতি ও স্মৃতির দুই একটি বিদ্যুৎঝলক তাঁহার চিত্তলোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি!

স্বামীকে তিনি দুঃখ ভুলিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের কণামাত্র বেদনাও কি বাজে নাই? স্বামী ও পুত্রকে কি তিনি মন হইতে নির্মমভাবে মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন? তিনি কি তাহাই চাহেন? পত্রিকার অস্তিমলগ্নে আসিয়া নারীহৃদয় নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি!

মহৎ প্রেমের এক শুচিস্নিগ্ধ রূপ!

সধবা চরিত্রের মধ্যে শেষ চরিত্র জনার। জনা কৈকেয়ীর উন্নততর সংস্করণ। কৈকেয়ী স্বার্থবোধের খুব উপরে উঠিতে পারে নাই। দশরথের দুর্বল মুহূর্তের প্রতিজ্ঞার দোহাই দিয়া নিজ স্বার্থরক্ষার মানসে—সপত্নীপুত্র জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের স্থলে নিজপুত্রের রাজ্যাভিষেকের প্রচেষ্টা এবং রামচন্দ্রকে চতুর্দশ বৎসর বনবাসের ব্যবস্থা করা নারীর এক স্বভাবসিদ্ধ নীচতার পরিচায়ক। কিন্তু জনার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। জনার ক্ষাত্রতেজ বাহ্যিক নহে, সত্যধর্ম ও রাজধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবীরকে যে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়াছে, সেই পুত্রহন্তাকে বন্ধুরূপে আপ্যায়ন করা সমস্ত নীতিধর্মের বিরোধী। জনার স্বামী ক্ষত্রিয় হইয়া সেই কাজ করিয়াছেন এবং ফলতঃ জনার অগ্নিনিঃস্রাবী বাণী উদ্‌গীর্ণ হইয়াছে। পাণ্ডবদের প্রতি তীব্র বাক্যবাণের মধ্যে জনার পরিচয় প্রাপ্তব্য নহে। জনা-চরিত্রে ক্ষাত্রতেজের স্ফুরণ ঘটিয়াছে বলিলেও সবটুকু বলা হয় না। জনা জীবনের এক নূতন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রেমের অপমান, মনুষ্যত্বের অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। মধুসূদনের দেবযানী পিতার নিকট একদা যাহা বলিয়াছিল, তাহারই পূর্ণ-পরিণতি জনায়।

ক্ষত্র কুলবালা আমি ; ক্ষত্র কুলবধূ

কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি

ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও বরণীয়। ক্ষত্রিয়-রমণীর অন্তরালে তাঁহার মাতৃহৃদয়ের হাহাকারও লক্ষণীয়। জনা-চরিত্রে মাতৃত্ব ও নারীত্ব যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পুত্রহীন সংসার তাঁহার কাছে অর্থহীন হইয়া দেখা দিয়াছে। পুত্র নাই—সুতরাং নারীর অবলম্বনীয় স্বামী—তাঁহার দুঃখ-বেদনায় সান্ত্বনাকারী। কিন্তু যে স্বামী পুত্রহন্তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া ন্যায়-নীতি, ধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম—সর্বোপরি মানবধর্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন তাহার কাছে জনার কোন প্রত্যাশাই থাকিতে পারে না। তাই সংসার জনার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন। ক্ষাত্রতেজ প্রদর্শনের উৎসাহে জনার মানবীয় দিকটি কবির নিকট অলক্ষিত থাকে নাই। স্বামীর অন্তরের হাহাকারও তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। রাজ্য পরিত্যাগের পুর্বে শেষবারের মত তিনি স্বামীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়াছেন। আগামী দিনের স্বামীর নিঃসঙ্গতার বেদনার উপলব্ধিও জনার আছে।

যাচি চির বিদায় ও পদে !
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?" বলি।

শেষ দুইটি চরণে এক পরম বিষাদ স্তম্ভিত হইয়া আছে।

অতঃপর বিধবা চরিত্র। বিধবার প্রেম ইতিপুর্বে আমাদের কাব্য-সাহিত্যের কোথাও বর্ণিত হয় নাই। অথচ তাহারও হৃদয় আছে, ভালবাসিবার মন আছে, প্রেমসৌন্দর্য সার্থকতার স্বপ্ন আছে। তাহার দেহমন-প্রাণের সেই পরম সত্যটিকে শাস্ত্রীয় নির্দেশের যুপকাষ্ঠে বলিদান

করা হইয়াছিল ; মধুসূদন তাহাকে উদ্ধার করিয়া সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন।

রামায়ণের সূর্পণখার কাহিনী হাস্যরস সৃষ্টির জন্যই খুব সম্ভব পরিকল্পিত হইয়াছিল। প্রথমে রামচন্দ্রের ভুবনমোহন কান্তিদর্শনে সূর্পণখা কামমোহিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রেম নিবেদন করেন ; রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট তাহাকে প্রেমনিবেদনের ইঙ্গিত দিলে তিনি তাহাই করেন। লক্ষ্মণও তাঁহাকে লইয়া পরিহাস করেন এবং তাহারই পরিণাম-স্বরূপ যখন তিনি সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হন তখন লক্ষ্মণ তাঁহার নাসিকা কর্তন করিয়া দেন। মধুসূদন এই কাহিনী গ্রহণ করেন নাই। অথচ এই কাহিনীর মধ্যে যে মানবিক ইঙ্গিতগুলি ছিল তাহাকে তিনি কাজে লাগাইয়াছেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের পরিবর্তে তিনি একটিমাত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিয়া সঙ্গতিরই পরিচয় দিয়াছেন। বনবাসে লক্ষ্মণের সহিত ঊর্মিলা ছিল না এবং স্বভাবতই সূর্পণখা তাঁহাকে অবিবাহিত বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলেন।

মূল রামায়ণে সূর্পণখার যে রূপাসক্তির চিত্র আছে মধুসূদন সেটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রামায়ণে রামচন্দ্রের রূপদর্শনে সূর্পণখার কামমোহিত চিত্তের প্রকাশ—এখানে লক্ষ্মণের রূপদর্শনে সূর্পণখার প্রেমবিকাশ।

"সা তু সূর্পণখা নাম দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
ভগিনী রামমাসাদ্য দদর্শ ত্রিদশোপমম্॥
দীপ্তাস্যঞ্চ মহাবাহুং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
গজবিক্রান্তগমনং জটামণ্ডলধারিণম্॥
সুকুমারং মহাসত্ত্বং পার্থিব ব্যঞ্জনান্বিতম্।
রামমিন্দীবরশ্যামং কন্দর্পসদৃশপ্রভম্॥
বভূবেন্দ্রোপমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসী কামমোহিতা।" [বাল্মীকি-রামায়ণ]

রামের নিকট বিফলমনোরথ হইয়া লক্ষ্মণের নিকট শূর্পণখা প্রেম নিবেদন করিয়াছে।

"এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্ত্তারং ভ্রাতরং মম ।
অসপত্না বরারোহে মেরুমর্ক প্রভা যথা ॥
ইতি রামেণ সা প্রোক্তা রাক্ষসী কামমোহিতা।
বিসৃজ্য রামং সহসা ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥
অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্যাহং বরবর্ণিনী।
ময়া সহ সুখং সর্ব্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি ॥"

[বাল্মীকি-রামায়ণ]

মধুসূদন এই সমস্ত পরিহার করিয়া শূর্পণখার প্রেমকে একমুখী ও তীব্র করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদন রামায়ণের কাহিনীর অন্তরালে নবযুগের আকৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন। স্বামীর সহিত স্ত্রীর জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক—ইহা নীতির কথা হইতে পারে, কিন্তু জীবনের সত্য নহে। নারীর হৃদয়-মন বলিয়া যে একটি পদার্থ আছে তাহা পরমতম সত্য। স্বামীকে হারাইয়া স্বামীর স্মৃতি অনুধ্যান করিয়া সমগ্র জীবন যাপন করা বহুক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। আবার যে নারী শুধু নামেমাত্র স্বামীকে পাইয়াছে, যাহার প্রেমস্বপ্ন বিন্দুমাত্র চরিতার্থ হয় নাই, অথচ যৌবনের স্বপ্নকামনা বারবার তাহার চেতনার দুয়ারে আঘাত করিয়াছে, সে যদি অপর কোন পুরুষকে ভালবাসিয়া নিজের জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চায়, তাহাকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বোত্তম কাজ ছিল বিধবাবিবাহ প্রবর্তন। তিনি প্রধানতঃ বালবিধবাদের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনও এমন একটি চরিত্র গ্রহণ করিয়াছেন যিনি শুধু বিধবা নহেন, বালবিধবা। বাহ্য ব্যাপারে নহে, আভ্যন্তর ব্যাপারেই মধুসূদনের গ্রন্থ-উৎসর্গ সার্থক। রূপের সরণি বাহিয়াই প্রেম আসিয়াছে—তাই এ প্রেমে

রূপাসক্তি আছে, কামনামদিরতা আছে। কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিয়া যথার্থ অনুরাগও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে আজন্ম-পালিত সূর্পণখা কেবল প্রেমের জন্যই সমস্ত বিলাস-ব্যসন পরিহার করিয়া বননিবাসিনী হইতে চাহিয়াছে। ঋষি-পত্নী তারা প্রেমের স্পর্শে আত্মসচেতন হইয়া একদিন প্রসাধন-পরিচর্যায় নিজেকে সজ্জিত করিতে আকুলতা প্রকাশ করিয়াছিল।

চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায়। চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলী, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতা হার কাঞ্চী কটিদেশে।

আর রাজভগিনী, বিলাসিনী সূর্পণখা সমস্ত ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী সাজিতে চাহিয়াছে—

রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন ; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ, ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী।
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে।

মনোজীবনের এ এক বিচিত্র রহস্য। প্রেমিকের যাহা কিছু তাহাকেই আপন করিয়া লইতে ইচ্ছা করে। 'মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাই'—সূর্পণখাও তাই রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিতে চাহিয়াছে। ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত হইয়াও বিলাস পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যাপৃত হইয়াছে। তাই সূর্পণখার প্রেম দেহাশ্রয়ী হইয়াও সত্য, দেহ-মন প্রাণের নিবিড় আকূতির বাস্তব

রূপায়ণে আকাঙ্ক্ষামুখর, বাসনা-উদ্বেল। বাঙ্‌লা সাহিত্যের আঙিনায় বিধবার আত্মার আকৃতি এই প্রথম প্রতিধ্বনিত হইল—এবং তাহাই পরবর্তীকালের বহু উপন্যাসের প্রেরণা যোগাইয়াছে।

নারী-জীবনের সামান্যতঃ যে তিনটি অবস্থা সম্ভব মধুসূদন তাহাদের কোনটিকেই বাদ দেন নাই। কুমারী প্রেম ও বিধবার প্রেমের বর্ণনা অপেক্ষা বিবাহিত প্রেমের রূপরহস্য আবিষ্কারে তিনি অধিক গুরুত্ব দান করিয়াছেন। গার্হস্থ্য-প্রেমের বৈচিত্র্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে ও কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহার পটভূমিকা রচনা করিয়াছেন কবি শ্রীমধুসূদন।

কিন্তু যে নারীকে কোন সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধা যায় না, তাহাকেও তিনি স্থান দিয়া কাব্যের নূতন দিগন্তের আভাস দিয়াছেন। 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী' পত্রিকা তাহার প্রমাণ। এই পত্রিকা রচনার পশ্চাতে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের প্রেরণা কাজ করিয়াছে। কবি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়া পত্রিকাখানির সূচনা তাহা কালিদাসের নাটকে গদ্যসংলাপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

"দ্বিতীয়ঃ। লক্ষ্মীভূমিকায়াং বর্তমানোর্বশী বারুনীভূমিকায়াং বর্তমানয়া মেনকয়া পৃষ্টা। সখি সমাগতা এতে ত্রৈলোক্যসুপুরুষাঃ, সকেশবাশ্চ লোকপালাঃ। কতমস্মিংস্তে ভাবাভিনিবেশ ইতি।

প্রথমঃ। ততস্ততঃ।

দ্বিতীয়ঃ। ততস্তয়া পুরুষোত্তম ইতি ভণিতব্যে পুরুরবসীতি নির্গতা বাণী।

প্রথমঃ। ভবিতব্য তানুবিধায়ীনীন্দ্রিয়াণি। ন খলু তামভিক্রুদ্ধো গুরুঃ।

দ্বিতীয়ঃ। সা খলু শপ্তোপাধ্যায়েন। মহেন্দ্রেণ পুনরনুগৃহীতা।"

এই নাটকীয় মুহূর্তটি তিনি কালিদাসের নাটক হইতে গ্রহণ

করিলেও উর্বশীকে তিনি নবরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। স্বর্গ—সুখ ও সৌন্দর্যের চির-আগার। কিন্তু উর্বশী সেখানেও আর সুখ লাভ করিতে পারিতেছেন না।

কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে।

যে প্রেম চরিত্রকে উন্নত করে, সেই বীর্যময় প্রেমের কথাই বীরাঙ্গনা-কাব্যে বারবার প্রকাশিত হইয়াছে। তাই বারবণিতা উর্বশী পুরুরবাকে ভালবাসিয়া বিলাস-ঐশ্বর্যের জীবন পরিহার করিয়া নূতন জীবন সুরু করিতে চাহিয়াছেন। প্রেম ভোগমুখী-চেতনাকেও ত্যাগের মহান মন্ত্রে দীক্ষিত করে। উর্বশীর প্রেমে রূপাসক্তি আছে, কিন্তু পৌরুষের প্রতি নারীর সশ্রদ্ধ বিমুগ্ধতাও বর্তমান। এই পৌরুষের আকর্ষণেই স্বর্গ-অপ্সরী মর্তমানবের প্রেয়সী হইবার আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ-স্বীকারেও প্রস্তুত হইয়াছেন। এই ত্যাগের মন্ত্র তিনি পাইয়াছেন প্রেমের নিকট। তাই তাঁহার প্রেমকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই।

দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!

মধুসূদনের বীরাঙ্গনার প্রতিটি চরিত্রই নিজ হৃদয়ের অনুভূত সত্য ব্যতীত অপর কিছুকেই গ্রহণ করেন নাই। তাই নারী—সমাজ, নীতি, বন্ধনের উর্ধ্বে থাকিয়া, স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে।

(১১)

[illegible]ঙ্গনা কোন্ শ্রেণীর রচনা? প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোন সাহিত্যিক-[illegible] সহিত ইহার আত্মীয়তা? ইহা কি প্রতীচ্যের দৃশ্যকাব্যের [illegible]য়ণীয় নাট্যকলায় দৃশ্যকাব্যকে দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত

করা হইয়াছে—নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম ও ঈহামৃগ। দৃশ্যকাব্য-প্রযোজনার ব্যাপারে অনুসৃত বৃত্তির জন্য এবং গল্পাংশের প্রকৃতি ও প্রবণতার আপেক্ষিকতার জন্য দৃশ্যকাব্যের শ্রেণীভেদের প্রয়োজন। উপরোক্ত দশটি শ্রেণীর মধ্যে ভাণ ও বীথি বীরাঙ্গনার গৃহীত রীতির সমধর্মা বলিয়া মনে হইতে পারে।

ভাণে একটিমাত্র চরিত্র—ধূর্ত অথবা বিট। সে একাকী দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে নিজের অনুভূত ব্যাপার বা অন্য ব্যক্তি সম্পর্কিত ঘটনার বর্ণনা করিতে থাকে এবং তাহার নিজের সম্মুখে অথবা দূরে অন্য ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহার সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত হয়। বীথীতে একটিমাত্র অঙ্ক থাকে তবে ইহার পাত্রপাত্রীর সংখ্যা একাধিক হইতে পারে এবং সকল প্রকার রসেরই সন্নিবেশ করা যায়।

বীরাঙ্গনার সহিত এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যিক নির্মিতির কোন সাদৃশ্য নাই। হাস্যরস-সৃষ্টির জন্যই ভাণ পরিকল্পিত। ইহার মধ্যে কোন গভীর ভাবসংকেত নাই, নিগূঢ় তাৎপর্যও নাই। কিন্তু মধুসূদনের কাব্য সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও লৌকিক তুচ্ছতার উর্ধ্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির ভাব-স্বাক্ষর।

তাহাছাড়া ভারতীয় নাট্যকলার এই স্বল্পপরিচিত রীতির সহিত মধুসূদনের পরিচয় না থাকাই স্বাভাবিক। সর্বোপরি এই শ্রেণীর অগভীর রচনার সহিত মধুসূদনের পরিচয় থাকিলেও তাহা তাঁহার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না। সুতরাং অনুসৃতির প্রশ্ন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

কোন কোন সমালোচক বীরাঙ্গনাকে গীতিনাট্য নামে আখ্যাত করিতে চান। এদেশে এবং বিদেশে গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য বহু লিখিত হইয়াছে এবং মোটামুটি তাহাদের একটি আদর্শও দাঁড়াইয়া,

গিয়াছে। সেই আদর্শের সহিত বীরাঙ্গনার সমগোত্রীয়তা নাই। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ,' 'বিদায় অভিশাপ,' 'গান্ধারীর আবেদন' ইত্যাদি যে শ্রেণীর রচনা, বীরাঙ্গনা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্যে—একাধিক চরিত্র সন্নিবেশিত হইয়া ঘটনা ও চরিত্রের জটিলতা সৃষ্টির বিস্তৃত অবকাশ রাখে, তাহা একটি চরিত্রের একক সংলাপ নহে।

কোন সমালোচক বীরাঙ্গনার রীতিকে dramatic monologue বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য-রস-বোদ্ধা মধুসূদন অবশ্যই এই রীতির সহিত পরিচিত ছিলেন এবং dramatic monologue রচনা করিবার জন্য ওভিদের দ্বারস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। বীরাঙ্গনাগণের বক্তব্য নাটকীয় সংলাপ নয়, পত্রিকা। যদিও সেই পত্রিকা এমন বিশিষ্ট রীতিতে রচিত হইয়াছে, যাহার মধ্যে নাটকীয়তা অবশ্যই আছে। বস্তুতঃ মধুসূদনের অবলম্বিত রীতি এত অভিনব যে তাহাকে dramatic monologue বলিলে তাঁহার নব-সৃজনী-প্রতিভাকেই অস্বীকার করা হয়। ইহার স্বাতন্ত্র্যই ইহার চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য—এই অভিনবতাই প্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর।

বস্তুতঃ বীরাঙ্গনা কাব্যে গল্পরসের অব্যাহত ধারার সহিত নাটকের সাংলাপিক মাধুর্যই যে সম্মিলিত হইয়াছে তাহাই নহে, এক অন্তরশায়ী গীতি-আকুলতার ভাবসমুদ্র সৌন্দর্যের মনোহর উপকূল রচনা করিয়াছে। ইহা বিশ্লেষণের অতীত, কাব্যদেহে ঐ ত্রিধারা একাত্ম, "অপৃথগ্-যত্ননির্বর্ত্য"।

সমস্ত কিছু বাদ দিয়া এই পত্রিকা-কাব্যের গল্পরসের মূল্যও কম নহে। প্রতিটি পত্রিকার মধ্যে অজস্র ঘটনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া আছে; অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সব মিলিয়া কাহিনীর ঐক্য স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোথাও কাহিনীর বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে নাই।

তাহার ফলে প্রত্যেকটি কাহিনীই স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মধুসূদন প্রধানতঃ যে তুই মহাকাব্যের জগতে বিচরণ করিয়াছেন, সেখানে ঘটনা অসংখ্য, অপরিমেয়। মধুসূদন সেই সকল ঘটনার সার-সংকলন করেন নাই। বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিশেষ তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং চরিত্রবিকাশের পক্ষে যে ঘটনাগুলি একান্ত অপরিহার্য কেবল সেইগুলিই গ্রহণ করিয়াছেন। ঘটনা কেবল ঘটনা-রূপেই গ্রাহ্য নহে। মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর মুকুরে তাহার স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত হয়। তাই একই ঘটনা বিভিন্ন চরিত্রের নিকট ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কাররূপে দেখানো যাইতে পারে। অর্জুনের উল্লেখ এই কাব্যের একাধিক পত্রিকায় আছে, কিন্তু মানসিক প্রবণতা ও অবস্থাভেদে এক একজনের নিকট তাহার চরিত্র ভিন্নরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অর্জুন-পত্নী দ্রৌপদী অর্জুনের বীরত্ব সম্পর্কে বলিয়াছে—

পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি।
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে ; নাশিবে কৌরবে।
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল রাজে ;

তিনি স্বামীর বীর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চিত। কিন্তু সেই বীর্যকে তিনি দেবত্বের আবরণে মণ্ডিত করেন নাই।

ভানুমতী, কৌরব-মহিষী হইয়াও, বলিয়াছেন—

দেব নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী।

ভানুমতী অর্জুনকে দেবতাদেরও পূজ্যরূপে দেখিয়াছেন। জয়দ্রথ-পত্নী দুঃশলা অর্জুনকে বিভীষিকারূপে লক্ষ্য করিয়াছেন—

কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে?

কিন্তু জনার বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত—

শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?

এখানে অর্জুন তো দেব নর পূজ্য নহেই, পাপী, চক্রান্তকারী ও ছলনাকারী। চারজনের কাছে অর্জুনের বীরত্ব, রণকুশলতা ভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মধুসূদন তো রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর সার-সঙ্কলন করিতে বসেন নাই, সেই জন্যই এমন হইতে পারিয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে কাহিনীর রূপান্তর-সাধন করিয়া তিনি যুগোচিত তাৎপর্য দান করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে 'সোমের প্রতি তারা,' 'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা' উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এহ বাহ্য। *প্রত্যেকটি পত্রিকার মর্মমূলে রহিয়াছে* একটি গীতি-স্পন্দন, গীতাত্মক ভাবানুভূতি। পত্রিকাগুলির মূল আবেদন কাহিনী-গৌরবে নহে, লিরিক-চেতনায়। প্রত্যেকটি পত্রিকার বক্তব্য

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এক একটি পত্রিকা এক একটি ভাবের ক্ষণিক প্রদীপ্তি, ভাবের একটি চকিত উচ্ছ্বাস। হৃদয়ভাবের এই উচ্ছ্বাসকে নাট্যধর্মে উন্নীত করা এককথায় অসম্ভব। কারণ ঐ দুইটিই পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভা সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্নভাবের এক একটি চকিত স্ফুরণ। কোথাও অতীত স্মৃতির পটভূমিকায় আশা-আশঙ্কা-শঙ্কুল এক নারী-হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস, কোথাও প্রেমজীবনের আকৃতি অতীত-স্মৃতির রোমন্থনে ভাবাতুর, কোথাও প্রথম প্রেম-শিহরণের একটি আবেগ-কম্পন, কোথাও প্রত্যাসন্ন দুর্যোগের মলিন দর্পণে স্বপ্ন-সম্ভাবনার ব্যর্থ আকৃতি, কোথাও ঈর্ষাজ্বালার আতপ্ত নিঃশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে। মূল বক্তব্য প্রকাশের পক্ষে চার-ছয় ছত্রই যথেষ্ট। সুতরাং ইহার দীর্ঘায়ত কাব্যদেহ নির্মাণ করিতে হইলে হয় ভাবের উচ্ছ্বাসে তটবন্ধনের সীমা অতিক্রম করিতে হইবে নতুবা তথ্য বা তত্ত্বের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন কোন নীতি বা তত্ত্বের দ্বারা তাঁহার কাব্য পূর্ণ করেন নাই, অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার সমাবেশ করেন নাই, এমন কি কেন্দ্রীয় ভাবকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তরলীভূত করিয়াও দেন নাই। পরম কাব্যোচিত সংযমের বন্ধনে এক অভিনব রূপকর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন।

মধুসূদন যে নাটকীয় ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ অনুধাবন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ প্রত্যেকটি পত্রিকার ক্ষেত্রে মধুসূদন একটি বিশেষ মুহূর্ত বাছিয়া লইয়াছেন। এক একটি পত্রিকা যেন একটি পঞ্চাঙ্ক-সমন্বিত নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চূড়ান্ত দৃশ্য—ক্লাইম্যাক্স। সঙ্কট মুহূর্তে পাঠকের চিত্তে চাঞ্চল্য জাগাইয়া পত্রিকার সূচনা। শেষ-বিদায়ের দিনে তারার অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ, চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত কৃষ্ণসমর্পিতা-প্রাণা রুক্মিণীর বিবাহের পূর্বলগ্নে দ্বারকানাথের নিকট

পত্রপ্রেরণ, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের মুহূর্তে কৈকেয়ীর নিদারুণ অভিযোগ ইত্যাদি তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

দ্বিতীয়তঃ মূল উদ্দেশ্য বা বক্তব্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া নাটকীয় সংঘর্ষের চেষ্টা কয়েকটি পত্রিকায় পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্রলিপির মধ্যে এই ধরণের নাটকীয় বৈপরীত্য ইহার নাট্যরসসৃজনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। সচেতনভাবে এই প্রচ্ছন্ন রাখিবার রীতিটি কৈকেয়ী ও জনা-পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়।

অযোধ্যা জুড়িয়া যে আনন্দোৎসব চলিতেছে তাহার মূল কারণ যে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক তাহা কৈকেয়ীর অপরিজ্ঞাত নহে, কিন্তু সে ভাব সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ সলিলে মগ্ন?······
কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজ পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?

এই মহোৎসবের হেতু কি? কেন দেবালয়ে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে, রঘু পুরোহিত স্বস্ত্যয়নে নিরত কেন? ইহার কারণ কি যজ্ঞানুষ্ঠান, যুদ্ধজয়, পুত্রের জন্ম-জনিত আনন্দোৎসব, অথবা বিবাহ?

অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুল রথি?
জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ
দিবে আজি? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা?

জনা-পত্রিকায় এই রীতি আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। রণসজ্জা,

বাস্ত ইত্যাদির ফলে জনার মনে হইয়াছে যে তাঁহার বীর, ক্ষত্রিয় স্বামী পুত্রহত্যার প্রতিশোধের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। অন্যায় সমরে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জনা উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

সাধিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে!
টুট কিরীটির গর্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূলদণ্ড-শিরে!

কিন্তু এ সমস্তই পার্থের আতিথ্যের নিমিত্ত জানিতে পারিয়া একটি বিপরীত ভাবের তরঙ্গ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। কৈকেয়ী ও জনা-পত্রিকায় সচেতনভাবে বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার কৌশল গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা' পত্রিকায় সূর্পণখা-চরিত্রে কিছুটা অজানার ভাব সন্নিবেশিত করিয়া এই শ্রেণীর রীতি মধুসূদন গ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্মণের নবীনযৌবন, দিব্যকান্তি, তথাপি তিনি তপস্বীর ন্যায় জটাজূটধারী—ইহার কারণ কি? নিজের বুদ্ধি ও মানসিক প্রবণতার দ্বারা তিনি ইহার কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তিনি হয়. রিপুর বিক্রমে পরাক্রান্ত, অর্থ প্রত্যাশী, নয়ত ব্যর্থ প্রেমিক। স্বাভাবিকভাবেই এই তিনটি কারণ তাহার মনে উদিত হইয়াছে। রাজ-পরিবারের কন্যা যুদ্ধবিগ্রহের সহিত পরিচিত এবং পরাজিত ব্যক্তি কখন কখন অন্যত্র আত্মগোপন করে এ তথ্যও বিদিত, সুতরাং তাঁহার ধারণা হইয়াছে ইনিও রিপুর বিক্রমে আক্রান্ত। তিনি নিজে অর্থ-সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিত—সুতরাং অর্থের কথা তাঁহার মনে হওয়া

স্বাভাবিক। সর্বোপরি শূর্পণখার হৃদয় প্রেম-বুভুক্ষু। সুতরাং তিনি লক্ষ্মণকে ব্যর্থ-প্রেমিক ভাবিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

কোন্ দুঃখে ভবসুখে বিমুখ হইলা
এ নবযৌবনে তুমি? কোন অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?
হেমাঙ্গ মৈনাক সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে?

*　　　　*　　　　*

যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র, দিব সেনা ভব বিজয়িনী···
যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র ;— অলকার ভাণ্ডার খুলিব···

এবং সবোপরি—

কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ) সেবিব তোমারে!

তৃতীয়তঃ কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশের বক্রতা চারুত্ব সম্পাদন করিয়াছে। নায়িকা যাঁহার কাছে হৃদয়মন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার নাম স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই। কৌশলে—বিভিন্ন ঘটনা ও বর্ণনার সাহায্যে প্রিয়তমের কথা নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাই বক্রোক্তি-চারুতা। এই রীতি সবাধিক সার্থকতার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রিকায়।

কে যে তিনি? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে······

তাঁহার জন্ম— 'গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে'। এবং জন্মের পর
জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে,
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহাযত্নে।

এই ভাবে জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এমন কি রূপের বর্ণনার সাহায্যে তিনি কে তাঁহার উত্তর দিয়াছেন। 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রিকাতেও এই রীতি অনুসৃত।

যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
হস্তিনা, তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে।

অথবা—

হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি—
"বাহন যাঁহার তুমি, মেঘকুল-পতি,
পুত্রবধূ তাঁর আমি ; বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারিধারা, নাথের চরণে।...'

এই শেষ চার চরণের প্রকাশ-বক্রতা সবিশেষ লক্ষণীয়। মেঘ ইন্দ্রের বাহন—তাই ইন্দ্র মেঘকুলপতি। কুন্তীর ইন্দ্রদত্ত পুত্র হইতেছেন অর্জুন—আর দ্রৌপদী নিজেকে অর্জুনের স্ত্রী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তিনি ইন্দ্রের পুত্রবধূ। এই প্রকাশ-বক্রতা ভাষার এক অসাধারণ ঐশ্বর্য।

চতুর্থতঃ একই পদের বা পদাংশের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে মূল বাক্যকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার রীতি বীরাঙ্গনা-কাব্যের কয়েকটি পত্রিকায় গৃহীত হইয়াছে। একটি পদ বা পদাংশ বার বার আবৃত্ত হওয়ায় একটি অখণ্ড ভাব-বলয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা অনেকটা সঙ্গীতের ধ্রুব-

পদের ন্যায়। ধ্রুবপদটি বার বার আবৃত্ত হইলে সঙ্গীতের সামগ্রিকতা সৃষ্টি করে। মধুসূদন এই রীতিটি সুকৌশলে গ্রহণ করিয়াছেন। কৈকেয়ী পত্রিকায় ধ্রুবপদ—'পরম অধর্মচারী রঘুকুল-পতি'—বার বার আবৃত্ত হইয়া ভাব যেমন তীব্রতা লাভ করিয়াছে, সেইরূপ তাহা একটি অখণ্ড ভাবেরও দ্যোতনা করিয়াছে।

সামগ্রিকভাবে না হইলেও এই রীতির অংশতঃ প্রয়োগ লক্ষ্য করা করা যায় শূর্পনখার পত্রে—

মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি! তা না হলে কভু
রাজাভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেমবশে?
দয়ার সাগর তুমি! দয়া কর মোরে।

পঞ্চমতঃ কোনো কোনো শব্দের বা বিষয়ের আকস্মিক নূতন অর্থ ও তাৎপর্য আবিষ্কারের ফলে একটা মানসিক তরঙ্গ সৃষ্টির অদ্ভুত নাটকীয় ভঙ্গী মধুসূদন গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকা। তারা চন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পন করিতে ব্যগ্র। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি আবেদন জানাইয়াছেন—

.........ধর আসি তারে
তারানাথ!

একান্ত সাধারণভাবেই চন্দ্রের বহুনামের মধ্যে একটি নাম তারা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—একান্ত অসতর্কভাবেই। কিন্তু এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপরীতমুখী চিন্তা, তাঁহারই ভাবনা-কামনার প্রতিফলন লক্ষ্য করিলেন ঐ উচ্চার্য শব্দটির মধ্যে। তাই বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এ নাম তাহাকে কে দিল?

তারানাথ ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে !
এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা ?

অধিকাংশ প্রেমিকের ক্ষেত্রেই লিপিলিখন সার্থক হইয়াছিল। কেবল, যে কয়টির ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, সেই সব লিপিকায় মধুসূদন বেদনা ও ব্যর্থতার গভীরতা প্রকাশ করিবার জন্য কামনা ও স্বপ্নকল্পনার এক বর্ণোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সাদার বুকে কালোর তিমির যবনিকা আরও বেশী স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। দুঃশলার পত্রখানি পৌঁছিবার পূর্বেই হয়ত তাঁহার স্বামীর জীবন-দীপ চিরতরে নির্বাপিত হইবে। তাঁহার স্বপ্নকামনা কোনদিনই আর সত্য হইয়া ধরা দিবে না, সেইজন্য তাঁহার পত্রিকাতেই প্রেম-স্বপ্নের এমন আশ্চর্য সুন্দর চিত্র—

ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে ! এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !

ষষ্ঠতঃ এই নাটকীয় বৈপরীত্য সৃষ্টির দ্বারা তিনি ইহার রসকে আরও গাঢ় ও গূঢ়সঞ্চারী করিয়া তুলিয়াছেন। সূর্পনখার প্রেমও সার্থকতালাভে বঞ্চিত হইয়াছিল এবং তাঁহার পত্রিকাতেও এই রীতি গৃহীত হইয়াছে। যথা—

চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে
লব পায়ে মানি তোমা, পরম আদরে,

অর্পিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষঃ-কুলপতি
দাসীরে কমল-পদে ।......
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ; আর কথা যত
নিবেদিব পাদপদ্মে বসিয়া বিরলে !

এই সমস্ত নাটকীয় রীতির বৈশিষ্ট্য ছাড়া রহিয়াছে ইহার অন্তঃসলিলা গীতি-রসধারা ও মনোলীন গীতিপ্রবাহ যাহা বিশ্লেষণের অতীত।

(১২)

মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দেই তাঁহার বীরাঙ্গনা রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যে এই ছন্দের প্রকৃতিটি একটু অনুধাবন করিতে হইবে। মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন।

জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর মথনে।
ধর্মাধর্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পর দুঃখে সদা আমি সুখী।

[চতুর্থাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

নূতন প্রচেষ্টা হিসাবে ইহার যাহা কিছু মূল্য। ভাব অনুযায়ী যতি স্থাপনের প্রয়াস এখানে পরিলক্ষিত হইলেও, অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল শক্তি তিনি তখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই ভাষা প্রায় গদ্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে ; কোন কোন চরণ সম্পূর্ণ পয়ার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন, 'গরল জন্মিয়াছিল সাগর মথনে' (জন্মিয়াছিল ক্রিয়া পদটি লক্ষণীয়) 'ধর্মধর্ম সকলি স/মান মোর কাছে—।'

ইহার পর 'তিলোত্তমাসম্ভব'-কাব্যে মধুসূদন অমিত্রাক্ষরের স্বরূপ কিছুটা উন্মোচিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ছন্দসাধনার দ্বিতীয় স্তর।

কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন? যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?

অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল ছন্দোস্পন্দ, পদমধ্যস্থ বিরামযতির কৌশল এখানেও কবি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিন্তু পূর্ববর্তী রচনা হইতে ইহা অনেকাংশে পৃথক। পূর্বের ন্যায় গদ্যগন্ধী রচনা এখানে সম্পূর্ণ অবর্তমান। কোন চরণকেই আর বহু-প্রচলিত পয়ার বলিয়া ভুল করিবার কারণ নাই। সর্বোপরি নিপুণ শব্দযোজনার দ্বারা ধ্বনিস্পন্দনও প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে ছন্দের যতি-সংযম ও গতি-সংযম অবশ্যই লক্ষণীয়।

মেঘনাদবধ কাব্যে আসিয়া এই ছন্দের অবলীলা-রূপ আমরা লক্ষ্য করিলাম।

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?

ইহার মধ্যে ছন্দোস্পন্দ, যতি ও ছেদের বিভাজন, পদমধ্যস্থিত বিরাম যতির কৌশল, সর্বোপরি এক মহাকাব্যিক সঙ্গীত একাকার হইয়া আছে।

এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটিয়াছে বীরাঙ্গনা কাব্যে। বীরাঙ্গনা কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। মধুসূদন এই ছন্দ সম্পর্কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—···I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 10th, 11th and 12th.'

বীরাঙ্গনা কাব্যেও এই যতি=ছেদ স্থাপন লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় অক্ষরের পর যতি স্থাপন :— যুঝেছ অনেক যুদ্ধ; অনেক বধেছ
রিপু। (জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা)

তৃতীয় অক্ষরের পর যতি স্থাপন—

বননিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
রাজেন্দ্র! (দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা)

চতুর্থ অক্ষরের পর যতি স্থাপন—

আইস গরুর ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি
গদাধর। (দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী)

ষষ্ঠ অক্ষর বা মাত্রার পর যতি স্থাপন—

সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে,
কহিলা সভয়ে—
(জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা)

দশম অক্ষর বা মাত্রার পরে যতি স্থাপন—

রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে
গাণ্ডীব,—
(দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী)

একাদশ অক্ষর বা মাত্রার পরে যতি স্থাপন—

গত রাত্রে অভিনিনু দেব নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক;
(পুরুরবার প্রতি উর্বশী)

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-ছন্দ বাঙ্‌লা ভাষার জাতি, প্রকৃতি ও প্রবণতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই অমিত্রাক্ষর পয়ারের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সৃজ্যমান বাঙলা গদ্যসাহিত্য হইতেও মধুসূদন সুস্পষ্ট সংকেত পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মোহিতলাল এ সম্পর্কে বলিয়াছেন—'সেই গদ্যের ভাষাও তাঁহার পরিকল্পিত মহাকাব্যের বাগ্‌বন্ধের প্রায় সমধর্মী। সেই গদ্যের বাক্যবিন্যাসে যে একটা ছন্দের আভাস ছিল, তাহা বাঙ্‌লা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। ইহার সেই বাক্যচ্ছন্দ নির্ভর করে প্রধানতঃ দুইটি বস্তুর উপর (১) বাক্যের অঙ্গসন্ধির ছেদগুলি (২) শব্দবিশেষের উপরে বাক্যরীতিগত ঝোঁক।···বিদ্যাসাগর প্রভৃতির গদ্যরচনাও তাঁহার (মাইকেলের) অজ্ঞাত ছিল না। এই সামান্য সংকেতগুলি হইতে তাঁহাকে তাঁহার ছন্দের প্রাথমিক উপকরণ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। তিলোত্তমা হইতে মেঘনাদে পৌঁছিয়া তিনি এই ভাবঅর্থের বাক্যচ্ছন্দকেই পয়ারের কাব্যছন্দের সহিত মিলাইয়া, অমিত্রাক্ষরের সেই আদি রূপটির একটি বড় পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন।'

বিদ্যাসাগর বাঙ্‌লা সাহিত্যে গদ্যরচনায় প্রথম ছন্দোস্পন্দন আবিষ্কার

করিয়াছিলেন। ভাষার ঐ সৌন্দর্য স্পষ্টতর করিবার জন্য উভয়েই অধিক মাত্রায় বিরামচিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যে এই Punctuation স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরকে এই গ্রন্থ-উৎসর্গ এই দিক দিয়াও সার্থক।

বীরাঙ্গনা-কাব্যে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের কী পরিমাণ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, তাহার বিচারের পূর্বে লৌকিক বুলি ও দেশজ শব্দকে মধুসূদন কী ভাবে কাব্যের আঙিনায় স্থান দিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করা দরকার। এই কাব্যে বহু অপাংক্তেয় শব্দ কাব্যের আম-দরবারে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে।

কয়েকটি উদাহরণ দ্রষ্টব্য—

(১) হাদে দেখ, ধূলারাশি উঠিছে গগনে। (দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা)

(২) কিম্বা দিয়া চুণ কালি গালে
খেদাও গহন বনে। (দশরথের প্রতি কৈকেয়ী)

(৩) মরি, বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি। (লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা)

(৪) নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে? (দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী)

(৫) কুলটা যে নারী—
বৈশ্যা গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? (নীলধ্বজের প্রতি জনা)

(৬) 'খসিয়া'

পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি সদৃশ (অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী)

ভাষার আশ্চর্য সংহতিও এখানে লক্ষ্য করা যায়; ইহার অনুরূপ

ভাবাচর্যা মধুসূদনের অপর কোন কাব্যে মিলিবে না। ভাষা এখানে প্রবচন সৃষ্টির স্তরে উঠিয়া গিয়াছে—

(১) জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে! (দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা)

(২) আশীর্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি! (সোমের প্রতি তারা)

(৩) কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে। (৪র্থ সর্গ)

(৪) স্বর্ণ অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে
কণ্ঠে, হস্তে, পরে নাকি রজত চরণে? (অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী)

(৫) কপোত মিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে! (জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা)

(৬) স্নেহের সরসে পদ্ম! আশার আকাশে
পূর্ণশশী। (শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী)

(৭) পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে। (ঐ)

বীরাঙ্গনায় মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কী অসাধারণ সাবলীলতা লাভ করিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ অপেক্ষা, মেঘনাদ বধ ও বীরাঙ্গনা—এই কাব্য দুইটির যে কোন অংশবিশেষ পাশাপাশি পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে।

ইংরাজী ছন্দে যাহাকে Musculine Pause বলা হয়, মধুসূদনের কবিমানস, তাহাকেই অপূর্ব রূপে বাংলাকাব্যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যেই ইহার সার্থকতর প্রকাশ।*

বননিবাসিনী দাসী। নমে রাজ পদে, ॥
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি। ভুলিয়াছ তারে, ॥

---

* মোহিতলাল বলিয়াছেন—'আমার মনে হয়, এইজন্যই তিনি বাংলা কর্মকারকে এ-বিভক্তি এবং বাংলা শব্দের শেষে সংস্কৃতের মত বিসর্গ ব্যবহার করিয়াছেন।'

ভুলিতে তোমারে কভু। পারে কি অভাগী ? ॥
হায়, আশামদে মত্ত। আমি পাগলিনী ! ॥

অর্থাৎ অর্ধযতি ও পূর্ণযতিতে, অষ্ট মাত্রা এবং চতুর্দশ মাত্রা বা অক্ষরগুলিকে স্বরান্ত রূপে সর্বত্র ব্যবহার করা হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য Verse-Paragraph** 'এই Verse Paragraph-এর আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে; কিন্তু ইহা তিনটি বা চারটি পংক্তির ব্যাপার নয়। স্বল্প ও দীর্ঘ বিরামযুক্ত বহু বাক্য ও বাক্যাংশের সমাহার—বা, সঙ্গীত সঙ্গতির সহায়ে একটি ভাব, একটি চিত্র বা একটি ব্যাখ্যান যেন পূর্ণ ছন্দ-রূপ লাভ করে—তাহাই অমিত্রাক্ষরের verse-paragraph. এ যেন ছন্দের একটি সৌরমণ্ডল—প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব গতি যেমন আছে তেমনই, সকলে এক একটি এক কেন্দ্রিক বৃহত্তর গতিচক্রের সঙ্গতি রক্ষা করিতে থাকে।'

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'সোমের প্রতি তারা' হইতে একটি verse-paragraph উদ্ধৃত করা হইল। এই সঙ্গে বীরাঙ্গনা কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাবলীলতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

যে দিন—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সেদিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে !—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনী সম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে !
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ;

**These combinations or paragraphs are informed by a perfect internal concert and rhythm held together by a chain of harmony.

বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজী
(বনরত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায় ! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী পদে,
দুকূল, কাঁচলী, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে স্মরি মৃগমদে ।
হায় রে, অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি !

বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যের ছন্দোবিশ্লেষণ না করিয়াও আশ্চর্য রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—"মেঘনাদবধের পর বীরাঙ্গনা কাব্যের স্বচ্ছন্দপ্রবাহ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ইহার সর্বত্রই একটি সঙ্গীত-ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া কাব্যখানিকে পরম উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে ; কবিত্বশক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে মধুসূদনের মেঘনাদবধ উৎকৃষ্ট ; কিন্তু ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে মধুকবির বীরাঙ্গনা সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।"

(১৩)

বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রভাব সুদূর প্রসারী এবং অন্তঃসঞ্চারী। নারীর যে নব-মহিমা, যে প্রবুদ্ধ আত্মচেতনা মধুসূদন আবিষ্কার করিলেন তাহাই বিচিত্ররূপে পরবর্তী বাঙ্‌লা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এমন কি বাঙ্‌লা সাহিত্যে নারীচরিত্রের প্রাধান্যের পিছনে মধুসূদনের দান অকিঞ্চিৎকর নহে। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে নারীমহিমার বিজয়-

বৈজয়ন্তী। 'কাঞ্চীকাবেরী' বাদ দিলে, রঙ্গলালের বাকী তিনটি আখ্যান-কাব্যই নারীর নামানুসারে করা হইয়াছে। বিহারীলাল 'বঙ্গসুন্দরী'র মধ্যে নারীর মহিমাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার যে কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, সেই কাব্যটির নাম 'মহিলা' এবং এই মহিলা-কাব্যে তিনি জায়া, জননী ও ভগিনীর রূপ অঙ্কন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; অবশ্য গ্রন্থখানি তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেনের ফুলের প্রতি বিশেষ প্রবণতা থাকিলেও তিনিও নারীমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বড়ালের সমস্ত রচনার মূলেই নারীর মহিমা কার্যকর ছিল। 'মানবীর তরে কাঁদি যাচি না দেবতা'—শেষ কাব্য পর্যন্ত এই মানবীর কথাতেই তাঁহার কাব্য পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের তাবৎ উপন্যাসে নারীর প্রাধান্য। রবীন্দ্রকাব্যেও নারী বিচিত্ররূপে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মাভৈঃ' প্রবন্ধে স্পষ্টতঃ নারীর প্রতি পুরুষের প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের তাবৎ উপন্যাসে নারীমহিমা মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকলের সম্মুখে যে কাব্য প্রতিষ্ঠিত তাহা 'বীরাঙ্গনা'।

বিশেষতঃ 'তারা' পরবর্তী বাঙলাসাহিত্যে পূর্ণায়ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যে অবস্থার মধ্য দিয়া তারার প্রেমচেতনা জাগ্রত হইয়াছিল তাহা বাঙলা সাহিত্যের একাধিক অবিস্মরণীয় চরিত্রের পথ নির্দেশ করিয়াছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের শৈবলিনীকে এ প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক। বৃহস্পতি শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত,

* তারা-পত্রিকাটি বীরাঙ্গনার শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। কিন্তু নৈতিক মানদণ্ড এককালে সাহিত্য বিচারের আদর্শ ছিল বলিয়া দীননাথ সান্যাল মহাশয় এই অপূর্ব পত্রিকাটিকে তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। নীতিবাদিতার দ্বারা সাহিত্য-রস কী পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়, ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

উদ্ভিন্নযৌবনা তারার প্রেম-বুভুক্ষু অন্তর দিব্যকান্তি সোমের মধ্য দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে চাহিয়াছিল! বৃহস্পতির অনুচ্চারিত কথাই যেন চন্দ্রশেখরের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—'শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন?···আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া এমন নবযুবতীর কি সুখ?'

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ের' চারু এবং শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কিরণময়ীর সহিত তাঁহার স্বামী হারাণের সম্পর্কও ছিল গুরু শিষ্যার ন্যায়। শুষ্ক শাস্ত্রালোচনার দ্বারা স্বামী, কিরণময়ীর প্রেমপিপাসা নিবারণ করিতে পারেন নাই; তদুপরি স্বামী মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন। ফলতঃ অনঙ্গ ডাক্তারের সাহায্যে তিনি আকণ্ঠ পিপাসার নিবৃত্তি করিতে চাহিয়াছেন, উপেন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। মধুসূদনে যাহা অঙ্কুর-রূপে বিদ্যমান ছিল, শরৎচন্দ্রে তাহাই শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত!

'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'বিদায় অভিশাপ'কে প্রভাবিত করিয়াছে। ভাব ও ভাষা—উভয় দিক হইতেই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একই পরিস্থিতিতে উভয়ের আত্মপ্রকাশ। শেষ বিদায়ের দিনে তারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, অনুরূপভাবে দেবযানীও কচের শেষ-বিদায়ের দিনে আপন অন্তর্জীবনের বেদনা ও কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন।

যেদিন প্রথম চন্দ্রের সহিত তাহার দেখা হয়, সেদিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তারা বলিয়াছেন—

যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে!

যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনী সম এ পরাণ মম
উল্লাসে—

রবীন্দ্রনাথের দেবযানীও কচের সহিত প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং মধুসূদনের অনুসরণ রবীন্দ্রনাথে সুস্পষ্ট। দেবযানী বলিয়াছেন—

যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ-অরুণ প্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তি ঢালা
চন্দন চর্চিতভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—

তারা চন্দ্রের শ্রমলাঘবের জন্য পূর্ব হইতেই পুষ্পচয়ন করিয়া রাখিতেন আর রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীর শ্রমলাঘবের জন্য জল তুলিয়া দিতেন।

তারা বলিয়াছেন—

পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম।"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি;
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে

এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারিদিকে
রাখিত তোমার জন্তে !

দেবযানী বলিয়াছেন—

ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্ত প্রফুল্লমুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে ?…
অপরাহ্নকালে
জলসেক করিতাম তরু আলবালে
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি
দিতে জল তুলে ?

তারা ও কচ উভয়েই মৃগশিশু ধরিয়াছেন ; কিন্তু তারার ক্ষেত্রে তাহা গভীরতম দ্যোতনা ও তাৎপর্য সৃষ্টি করিয়াছে, কচের ক্ষেত্রে তাহা নহে।

তারা পত্রিকায়—

চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে।

দেবযানী বলিয়াছেন—

কেন পাঠ পরিহরি
পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিরে ?

অপর সধবা চরিত্র জনার প্রেরণায় গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটক রচিত। শুধু তাহাই নহে, মধুসূদনের জনা পত্রিকার তিনি হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন। ভাবের ও ভঙ্গীর মিল ত আছেই, ভাষা পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

জনা পত্রিকার সূচনা অংশ—

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হেষে অশ্ব ; গর্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ; কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে—

গিরিশচন্দ্র ইহারই অনুসরণে লিখিয়াছেন—

আনন্দ উৎসব।
দেখিলাম নগরে, রাজন।
মহোৎসব—মহা আয়োজন
কার অভ্যর্থনা হেতু ?
বৈরী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার
কিম্বা, রাজা সাজিছে বাহিনী
পুত্রনাশ প্রতিবিধিৎসিতে ?
কহ কেন নানাবর্ণ উড়িছে পতাকা
নগর কুসুম মালী।

ভানুমতীর চরিত্রের ধর্মবোধই রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী চরিত্রে আরও গভীরতর ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

বিধবার প্রেম সর্বপ্রথমে মধুসূদনের সূর্পণখা-পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনীর চরিত্রে এবং রোহিনী চরিত্রে তাহা অপূর্ব সার্থকতার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। সূর্পণখায় যাহার সূচনা, রোহিনী চরিত্রে তাহারই দীপ্ত সম্ভাবনা। রোহিনী বলিয়াছে—'কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল ? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কী গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীতে সুখভোগ

করিতে পাইলাম না।' এই প্রেমের এক প্রলয়ঙ্করী মূর্তি 'চোখের বালি'র বিনোদিনী।

মধুসূদনের উর্বশী-পত্রিকায় দেখা যায় যে সে স্বর্বেশ্যা হইয়াও প্রেমের ঐকান্তিকতায় মর্ত্যমানবের প্রেয়সী হইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছে। সূর্পণখা বিলাস-ঐশ্বর্যের জীবন পরিহার করিয়া ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা লইতে চাহিয়াছে। বঙ্কিমের মতিবিবি* ইহাদেরকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রেমের চেতনায় সেও দিল্লীর রাজ-ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। তাহার কোন কোন উক্তি বীরাঙ্গনা কাব্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

মতিবিবি নবকুমারকে বলিয়াছে—'তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না, কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি।'

এই উক্তি সূর্পণখার উক্তিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে!…
যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র; অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্নজালে!
মণিযোনি খনি যত দিব হে তোমারে।

*মতিবিবির উপর বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকার ছায়াসম্পাত ঘটিয়াছে ইহা শুধুমাত্র আমাদের অনুমান নহে। এই উপন্যাসে এবং বিশেষতঃ মতিবিবির চরিত্র-চিত্রণে তিনি বার বার বীরাঙ্গনা কাব্য স্মরণ করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে' এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'কায়, মনঃ, প্রাণ, আমি সঁপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।'
উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উভয় পরিচ্ছেদেই মতিবিবির কথা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রেম উদাসীন, যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন যুবতীর (আহা, ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী !) কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব ?......................
এস, গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে !
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে !
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।

প্রেমের জন্যই সুর্পণখা বিলাস-ভূষণ পরিত্যাগ করিয়াছিল ; 'রাজসিংহ' উপন্যাসের জেবউন্নিসাও রাজবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির উপর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল— 'বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী বিললাপবিকীর্ণমূর্দ্ধজা।'

শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী ইত্যাদির মধ্যে বারবণিতার প্রেম অসাধারণ শিল্পকৌশলে মণ্ডিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বীরাঙ্গনা কাব্যে আকৃষ্ট হইয়া পরবর্তী কালের কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন রচনা করিয়াছিলেন 'অপূব বীরাঙ্গনা' কাব্য। ইহাই চূড়ান্ত অনুসৃতির পরিচয়।

বীরাঙ্গনা কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

মঙ্গলাচরণ।

বঙ্গকুলচূড়া

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম

এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে

স্থাপিত করিয়া,

কাব্যকার

ইহা

উক্ত মহানুভবের নিকট

যথোচিত সম্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল।

ইতি।

১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।

বীরাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনকজননীকর্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়াপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসংকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা, তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত, স্বরাজ্যে গমনানন্তর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!

হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে ;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে ;
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ ! আশার ছলনে,
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে ;
কহি—'হ্লাদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে !
ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে !
ওই শোন্ কোলাহল ! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে !'
নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা ;
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে !
 দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ ; চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে ।
দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা ;
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ ; মরমরে পাতাকুল নাচি ;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া ।
সুধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে,—'রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা ? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল সুধা ?'

কহি পিকে,—‘কেন তুমি, পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে ?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে ?
মদনের দাস মধু ; মধুর অধীনে
তুমি ; সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে ?’
অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃদু স্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে !
শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি,—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।
কহি পত্রে,—‘শোন্, পত্র ;—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুখাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে ;—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যাজিলা নৃপতি ?’
মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে ;
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম ! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ ! উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে !
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে !
ডাকি উচ্চে অলিরাজে ; কহি,—‘ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ ! রক্ষিতে দাসীরে

সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !'
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ?
    কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র ; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা ! পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে ?
কভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে ;—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
ফেল রাজ-পদ-তলে যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি !'
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে ;—
'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
যথায় জীবিতনাথ ! হায়, মরি আমি
বিরহে ! শৈশবে তোরে পালিনু যতনে ;
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি !'
    আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া,
নরেশ্বর ? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে

অভাগীর দুঃখ-কথা! এ দুজন যদি
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি; কেন না
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে!—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে!
ফাটি অস্ফুরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে!
আর আর স্থল যত,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে! যে তরুর মূলে
গন্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে!—
হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে?
এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে?
এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী,
প্রাণনাথ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃষসা,—মনঃ তাঁর রত তপজপে:
তা না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে! নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব! মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ; নাহি অন্নে রুচি;
না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে!
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সন্তত জ্ঞান; চেতন পাইয়া

মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে !
অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে !
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা !
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা কারে ?
দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে ?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে ;
ফুলশয্যা ; বিদ্যাধরী-সঙ্গিনী কিঙ্করী ;
কেহ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা সদনে যেন ! শুনি বীণা-ধ্বনি ;
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে—
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি !
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণসিংহাসনে !
শিরোপরি রাজছত্র ; রাজদণ্ড হাতে,
মণ্ডিত অমূল্য-রত্নে ; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব চরণে !
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে ?
জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ

ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে
কুল, মান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি !
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !
চির-অভাগিনী আমি ! জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে ?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ?
এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ ? শুনিয়াছি রথীশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে ;
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা কুলের বালা আমি—সুখ মম !
আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে ;
কি কব তাঁহারে নাথ, কহ, তা দাসীরে ?

নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বলে
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে ?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে !

বনচর চর, নাথ ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম
প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না; ও সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি !—
কি লজ্জা ! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে ! হস্তদাসী সদা
তুই ; মনোদাস হস্ত ; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই ? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা !

হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি!—
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে!
এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ!—তারানাথ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে!
এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু আছিল হৃদয়ে
অঙ্কুরিত; কিন্তু--ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে!
কে পারে লুকাতে কবে জলন্ত পাবকে?
এস তবে, প্রাণসখে! তারানাথ তুমি;
জুড়াও তারার জ্বালা! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি?
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে?
যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে

সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে !—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে !
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ;
বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজী,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির পরিধান মম বাকল . ঘৃণিনু
তাহায় ! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে !
হায় রে, অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !—
তারার যৌবন-বন ঋতুরাজ তুমি !
বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে ; গৃহকর্ম্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা !
কি ছার, নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা ?
কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী !

বর্ষ বাক্যসুধা তুমি! নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি!
 গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন; অহরহঃ, বিরহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে!
 গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে।
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!
 গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে?
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু
তাম্বুল শয়নধামে? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে?
হায় রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে;
কোমল কমল-নিন্দ্য ও বরাঙ্গ তব,
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী!
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে?

পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম!"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি;—
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে
রাখিত তোমার জন্যে! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে।
কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী!—
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে?
কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও কর-কমলে, সখা, কহিস্ তাঁহারে,—
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে'।"
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে!—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে!
শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,

কি আর কহিব তার ? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি ! নাহি জ্ঞান ; না জানি কি লিখি !
কাঁদিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে !
ঢাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি । ভ্রান্তিমদে মাতি,
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে !
প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে ;—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,—'রে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী ?
তবে কেন,—' কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা !
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে !
তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে !
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবানিশি ! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক্, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে ? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী !

কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?
ক্ষম, সখে !—পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব কারাগারে !
এস তুমি ; এস শীঘ্র ! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে !
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে !
কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্ব জনে ।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে ।
এস, হে তারার বাঞ্ছা ! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !
সুধাময় ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে !
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি !
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি !
আর কি লিখিবে দাসী ? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষম ভ্রম ; ক্ষম দোষ ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল
লেখনী ? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে ।

লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে !
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু ! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি !
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ ! কি আর কহিব ?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাম
দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মীঅবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।]

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব ;—
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে !
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে ;

না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিয়া থরথরে ! না জানি কি করি ;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ-কাহিনী !
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু ! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে !
নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে ;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে
বরভাবে ! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি ; কিন্তু কহি, শুন,
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগত-কর্ণে সুধার লহরী !
কে যে তিনি ? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে ?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে ;
তুলিয়া কুসুম-রাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া ।
গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে ।—
রাজরোষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে !
খনিগর্ভে ফলে মণি ; মুক্তা শুক্তিধামে !
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে ;
শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা ! গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা স্বননে
সমীরণ ; নদ নদী কলকলকলে

সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি ;
কল্লোলিলা জলপতি গভীর নিনাদে !
নাচিলা অপ্সরা স্বর্গে ; মর্ত্ত্যে নর নারী !
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে !
বৃষ্টিলা কুসুম দেব ; পাইল দরিদ্র
রতন ; জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন !
পূরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে ।
       জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে,
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহা যত্নে । মহারত্ন পাইলে যেমতি
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে !
       আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী
পুত্রভাবে । বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত
খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে ?
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পুতনারে ? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি,
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে ?
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি,
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে ?
আর আর কীর্ত্তি যত বিদিত জগতে ?
       যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দলে লয়ে
রসরাজ ; মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে !

বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু ; যমুনা-পুলিনে !
এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী। আর কব কত ?
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে !
    না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে !
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখি-পুচ্ছ শিরে ;
ত্রিভঙ্গ ; সুগল-দেশে বরগুঞ্জমালা ;
মধুর অধরে বাঁশী ; বাস পীত ধড়া ;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে—
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম ! মোক্ষ-ধাম ভবে !
    যত বার হেরি, দেব, আকাশ-মণ্ডলে,
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে ;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে ;—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি, পুজি ভক্তি-ভাবে !
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি—'প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে !'
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে !
নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি !
মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি
গোপ-কুল-বালা আমি ; বেণুর সুরবে

ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে !
কহি শিখীবরে,—'ধন্য তুই পক্ষিকুলে,
শিখণ্ডি ! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জ্জটি !'—
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে ?
শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে !
কি লজ্জা ! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি !
কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী ?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে
কায় মনঃ ; অন্য জনে—ক্ষম, গুণনিধি !—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে !
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ?
আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,
গদাধর ! রূপ গুণ থাকিত যদ্যপি
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারি,
আইস ; বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে !'
কিন্তু নাহি রূপ গুণ , কোন্ মুখ দিয়া

অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা !
দীন আমি ; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি ;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যার দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে !

রুক্ম নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি ;
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী ;
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা ! চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি ;—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে !
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে !

কি ছলে ভুলাই মনঃ ; কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি !

বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে ;
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি ! কূলে তাঁর কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে !
পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ;
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজী ।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে !
কত কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া !
কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে !

আছে বহু গাভী গোষ্ঠে; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি!
যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা;
যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি
শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে;—কত যে কি করি,
হায়, পাগলিনী আমি! কি কাজ কহিয়া?
আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিত; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী,
বধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে!
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি?
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে রুক্মিণীপত্রিকা নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ী দেবী মন্থরানাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
কহ তুমি :—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে, কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী?
কেন এত বীণা-ধ্বনি? কহ, দেব, শুনি,

কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুল-শ্রেষ্ঠ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শংখ, ঘণ্টা ঘটারোলে?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে? রঘু-কুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি?
জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ
দিবে আজি? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে!
কহ, শুনি, হে রাজন্; এ বয়েসে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল!—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি?
    হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি?
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—'অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পতি!
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙেন সহজে!
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে!'
    অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে

কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চুণ কালি গালে
খেদাও গহন বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ঘুচিবে
এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে ।
  না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব ! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধা-হীন অধর ! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম কান্তি, নীরসি কুসুমে !
  কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিলা জলাঞ্জলি ;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে ।

এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ স্বললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !
        ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ?   কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?
    তিন রাণী তব, রাজা !   এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ?   পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইয়া মনঃ তব ?   কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
    কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ?   কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ?   বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী

ভিখারিণী-বেশে দাসী ! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি।'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে !
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি !'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বাল-দলে।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ?

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি ! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি !)—
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি !
পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন ; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।
চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে ;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী ;
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকয়ীপত্রিকা নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা

[যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে ?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি ?
ফাটে বুক জটাজূট হেরি তব শিরে,
মঞ্জুকেশি ! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে !
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে
তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি !
সুবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি,
কেন না—নিবাস তব বঙ্কুল মঞ্জুলে !

হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,—
কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি ? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে ?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে ?
তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র ; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী
রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে !
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে !
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিব তব পদে, শূর ! চামুণ্ডা আপনি,
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা হাতে,
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস !—যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র ;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ ; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন-জালে !
মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে।

প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী !)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব ? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে !
আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব
শয্যা তব ! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী।
সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে আমার বসতি—
মুক্তাময় মাঝ তার ; সোপান খচিত
মরকতে ; স্তম্ভে হীরা ; পদ্মরাগ মণি ;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে !
সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
দিবানিশি ; গায় পাখী সুমধুর স্বরে ;
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল ! শত শত কুসুম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে !
খেলে উৎস ; চলে জল কলকল কলে !
কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে !
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে !
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে ;

নহে কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজুটে শিরঃ; ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে;
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু?—বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা; নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে। দেখ চেয়ে; ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী!—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায়! সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্য্যের পানে!—
কি আর কহিব তার? যত ক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ; থাকিত দাঁড়ায়ে

প্রেমের নিগড়ে বন্ধা এ তোমার দাসী !
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি !
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা !
কিন্তু বৃথা কহি কথা !   পড়িও, নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে !
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে ; বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে ;
তুষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে !
লয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে ;
সহজে হইবে পার।   নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ।   এস, গুণনিধি ;
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে !
   যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে।   বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ, ভগিনী তাঁর দাসী : লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা।
কত যে বয়েস তার ; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি !
আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি !
আইস ভ্রমর-রূপে ; না যোগায় যদি

মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে ! কি আর কহিব ?
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে ! এস, সখে, তুমি ;—
এই নিবেদন করে সূর্পণখা পদে ।
   শুন নিবেদন পুনঃ । এত দূর লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে,
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি,
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি,
তাঁহার ; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু । কি আশ্চর্য্য ! মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি ! তা না হলে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ?
দয়ার সাগর তুমি । কর দয়া মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে !
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে ।
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষঃ-কুল-পতি
দাসীরে কমল-পদে । কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা ; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী ।
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ; আর কথা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে ।
   ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে ; আনন্দে বহিছে

অশ্রু-ধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে? আসি ত্বরা করি,
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে সূর্পণখাপত্রিকা নাম
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীরবর অর্জ্জুন বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে?
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী; সু-উরু রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী!
উর্ব্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে!
নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা
চারুনেত্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা;
সুলোচনা সুলোচনা; কেহ গায় সুখে;
কেহ নাচে,—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে!
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে!

কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি, নিত্য রসবতী
সুরবালা:—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?
    নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি
সাজান সে বনরাজী বিরাজি সে বনে
নিরন্তর; নিরন্তর গায় পাখী শাখে;
না শুখায় ফুলকুল, মণি মুক্তা হীরা
স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত!
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি
গন্ধামোদে পূরি দেশ! কিন্তু এ বর্ণনে
কি কাজ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি!
স্বশরীরে স্বর্গভোগ! কার ভাগ্য হেন
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভব-মণ্ডলে?
ধন্য নর-কুলে তুমি! ধন্য পুণ্য তব!
    পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে,
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্ব্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে!

হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম !
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে কবে মোরে ? সুধিব কাহারে ?
রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী,
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা ! অবিরল লুটে
পরিমল ! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত,
(কি লজ্জা !) অধর-মধু পান করে সুখে !
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি ! কারে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম ? কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
শুন তুমি, প্রাণকান্ত ! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে ;
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে !
সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে ;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
কিরীটি ? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন !
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে ?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয় এই জানি, এই মানি মনে।

যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি!
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে?
যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে
রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে! সখীদলে লয়ে
কত যে খে'লনু খেলা, কহিব কেমনে?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
পূজিতাম শিবধনুঃ। কহিতাম সাধে,—
'ঋষিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় সবলে!
তা হলে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি!'
শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে
রাজহংসে; দিয়া তারে আহার, পরায়ে
সুবর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—
'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
হস্তিনা;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে; তাঁর পদে কহিও দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে!'
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া।

হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি ;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল পতি,
পুত্রবধূ তাঁর আমি ; বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে !
জল-দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি,
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি !
মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে !'
আর কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে
জনরব—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী'—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে ?
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে !
প্রার্থিনু রতিরে পূজি,—'হর-কোপানলে,
হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব,
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি !'
পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক, পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে !
সাধিনু মাটিরে ফাটি হইতে দুখানি !
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু, 'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি-সদৃশ,
হে লক্ষ্য ! জ্বলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণ-পতি জতুগৃহে জ্বলিলা যেমতি
না চাহি বাঁচিতে আর ! বাঁচিব কি সাধে ?'

উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত।'—
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে।
ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে,
রথীশ্বর? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ্ণ শর! সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ; শুনিনু সুরাণী
(স্বপ্নে যেন!) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি!
ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে!'
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্য দোষে! তা হলে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী?
কিন্তু বৃথা এ বিলাপ;—হুহুঙ্কারি রোষে,
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে,
অম্বুরাশি-নাদ সম কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ম্বরে;—কি কথা কহিয়া
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে?
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী? আসন্ন কালে সে সুকথাগুলি
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে!
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর স্বরে;—
'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি
চন্দ্রমুখি! যত ক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে

থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে, শিরোমণি ?
আমি পার্থ !' ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে
অনর্গল অশ্রুজল এ লিপি ! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন !—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে !
আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী !—* *
* * এত দূর লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী । আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত । বসি তরু-মূলে,
হায় রে, তিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে !
কে মুছিল চক্ষুঃ-জল ? কে মুছিবে কহ ?
কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে ?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে ;
কিম্বা পান করি বিষ ; কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব
হেরিতে ও পদযুগ,—সান্ত্বনি পরাণে,
ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে !
অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায় ! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি আসি দেখা দেবে এ কাননে ?
কহ ত্রিদিবের বার্ত্তা । কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে !
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত ; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে !

শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী ;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
তুষিতে পার হে যদি সুর-বালা-দলে,
এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি,
পায় যেন অভাগীরে চরণ-কমলে
ক্ষণকাল ! জুড়াইব নয়ন সুমতি
ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদে ;
অপ্সরা-বল্লভ তুমি ; নর-নারী দাসী ;
তা বলে করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে !
স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে ; পারে না কি রজত চরণে ?
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি ।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রত সদা ধর্ম্মরাজ-ঋষি ;
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে
শাস্ত্রালাপে । মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম , অনুজ-দ্বয়, মহা-ভক্তিভাবে,
সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে , যথাসাধ্য, দাসী
নিষ্পাদে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য্য যত ।
কিন্তু ক্ষুন্নমনা সবে তোমার বিহনে !
স্মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব ; স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, কাঁদে দিবা নিশি !
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ ভ্রমি একাকিনী,

পূর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে!
পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি।
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে; নাশিবে কৌরবে!
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে!
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে!
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি!
কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ, সুরপুরে,
অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি? এই সুর-দলে
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুংকারে,
দমিলা খাণ্ডব-রণে! জিনিলা একাকী
লক্ষরাজে, রথিরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে।
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে! এ ছলনা, কহ, কি কারণে?
এস ফিরি, নররত্ন! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী?
কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ!
আর কি অধিক কব? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে!
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী; পূর্ব্বপুণ্য-বলে

স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর! তেজস্বী সুশিক্ষিত
দিবামুখে রবি যেন! বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত! দয়া করি দর্শিবেন তিনি,
মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে।
যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি!
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।
কি কহিনু নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দ্রৌপদী-পত্রিকা নাম
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে!
নাহি নিদ্রা; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে!
না পারি দেখিতে চখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোদ্যানে;
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে!
শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি,
কাঁপে হিয়া থরথরে! যাই পুনঃ ফিরি।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি!
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী!

মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি শাশুড়ীর পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা দুখানি!
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে!
নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী;
কাঁদে কুরু-বধূ যত! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি, কুরু কুল-শিশু,
হেরি এ অমঙ্গলে, হায়, না জানি কি হেতু!
দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে!

কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে!—
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষবিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে!
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্মতি,
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে!

ধর্ম্মশীল কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ-সম
কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে,
ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্ব্বার সমরে!
দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী!
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমতি,
সহ কিন্তু সহদেব, জান না কি তুমি?
মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী!
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায় ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা-জলে?

অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি ?
অম্বু-বিম্ব, নীরবৃন্দ ফুলদূর্ব্বাদলে
নহে মুক্তাফল, দেব ! কি আর কহিব ?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে ?
   এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি ! ভাবি দেখ,— চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে
ভাসে লোক ; তুমি যার পরমারি, রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে !
হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম,
আনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে ?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি !
   কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর,
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে ;
তোমা সহ কুরুসৈন্যে দলিল একাকী
মৎস্যদেশে ; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে ?
হায়, বৃথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে ?

সূতপুত্র সখা তব ? কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড়, কুরুবংশপতি ?
  জানি আমি ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য গুরু।
স্নেহজলবাহিনী কিন্তু এ দোঁহার বহে
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত, কহিনু তোমারে !
যদিও না হয় তাহা, তবুও কেমনে,
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ?—
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরদ্বয়ে ! কুক্ষণে কি, তুমি,
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনিরে
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ?
  শুন, নাথ ; নিদ্রা-আবেশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি ; দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে !
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ ! বাম করে
গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম ! ইরম্মদ তেজা
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে !
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি !
গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল মেঘ যেন
ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া
কালাগ্নি ! কি কব, দেব, কিরীটের আভা ?
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে !
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য-পানে
ধায় রথবর বেগে ! পালায় চৌদিকে

কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কূজনি
ভীতচিত ; মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া!
কি কব ভীমের কথা? মদকল-করী-
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে!
জবাযুগ-সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা।
মার, মার শব্দ মুখে! ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা!
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে
ধরিলা দুরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী।
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—
সর্ব্ব-অন্তকারী যিনি! ধাত্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে! নর-নারী-স্তন দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে?
বাড়িতে লাগিল লিপি ; তবুও কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু ;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি ;
আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে
এ কুহক! গত রাত্রে বসি একাকিনী
শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু! সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে
দশ দিশ ; পূর্ণচন্দ্র-আভা জিনি আভা
উজ্জ্বলিল চারি দিক্ ; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে!

চমকি চরণযুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়নজল, কহিলা কাতরে
বিধুমুখী,—'বৃথা খেদ, কুরুকুলবধূ,
কেন তুমি কর আর? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির বাঁধন, হায়, এ ভবমণ্ডলে?
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র!'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি!
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে; হতগতি অশ্ব; রথাবলী
ভগ্ন; শত শত শব! কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে!
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি!
আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনু;—দাঁড়ায়ে নিকটে,
আস্ফালিছে অসি অরি-মস্তক ছেদিতে।
আর এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূশয্যায়। রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি
রথচক্র; নাহি বক্ষে কবচ; আকাশে
আভাহীন ভানুদেব,—মহাশোকে যেন!
অদূরে দেখিনু হ্রদ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন-উরু! কাঁদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া!
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে?
    এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি

পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী।
কি অভাব তব, কহ? তোষ পঞ্চ জনে;
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে; তোষ অভাগীরে;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানুমতীপত্রিকা নাম
সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি!
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া ;—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা। কহিলা সুমতি—
(না জানি পুত্রের কথা ; ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে,) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে।
প্রাণপণে যোঝে যোধ ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ। ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু!' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয়! নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া।

'দেখ, কুরুকুলনাথ,'—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্ত রথী ! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে !
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ,
সভয়ে হ্রেষিছে অশ্ব ! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে !—
মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে !'

কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা , কাঁদিয়া মুছিলা
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা ;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড-টংকার, প্রভু ! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ ! কোন রথী গুণ সহ কাটে
ধনু ; কেহ রথচূড, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ ; মরিল অশ্ব ; মরিল সারথি !
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে !'—

নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী ;—'আহা। চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে !
অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জ্জুনি ! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,

নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে !
নিরানন্দে ধৰ্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে ।'
      হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা ; কাঁদিনু আমি । সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে,
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি !
পূজ কুলদেবে শীঘ্র আমাদের হেতু !
ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি
অধীর বিষম শোকে ! গরজে গম্ভীরে
হনু স্বর্ণরথচূড়ে । পড়িছে ভূতলে
খেচর ; ভূচরকুল পালাইছে দূরে !
ঝকঝকে দিব্য বর্ম , খেলিছে কিরীটে
চপলা ; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে !
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু , পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে !
মুহুর্মুহুঃ ভীমনাদ টংকারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাস ! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ,—
কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত ,
তুমি, হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;
তুমি, স্বর্গ, শুন ; তুমি, পাতাল, পাতালে ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে ! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি !

অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে!'—
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে!
কহ এ দাসীরে, নাথ; কহ সত্য করি,
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ? কোথায় রোধিবে
কোন রাহুমুখ তুমি, কহ তা আমারে?
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে!
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি!
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে!
নাহি সরে কথা, নাথ, বিশুষ্ক মুখে!
কাল অজগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে?
হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে, কোন পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে
তুমি? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে!
নাদিল কাতরে শিবা; কুক্কুর কাঁদিল
কোলাহলে; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল! কহিলা জনকে

বিদুর,—সুমতি তাত! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে!' না শুনিলা পিতা
সে কথা! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে!
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল!
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
কৌরব-পঙ্কজ-রবি চির রাহুগ্রাসে!
বীরাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে!
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে?
এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি!
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনু,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে! কি কাজ রণে তোমার? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্য ধনে?
তবে যদি কুরুরাজে ভাল বাস তুমি
মম হেতু, প্রাণনাথ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
আত্মা মোর কুরুরাজ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি!
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব?—আর কি কহিব?

কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ?
তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা !) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ ? দেখাইল তাঁরে
উরু ? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ?
ভ্রাতার সুকীর্তি যত, জান না কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী !
এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি !
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি ! কে না জানে, কহ,
মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি ?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ
রিপু ; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব দাহনে ?
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্বাধিপতি ?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর-কালে ?
স্মর, প্রভু ! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুরুসৈন্য নেতা যত পার্থের প্রতাপে ?
এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ?

কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে?
   ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি ; মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি!
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে!
   জানি আমি কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী!—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে!
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ; অশ্বত্থামা, শূরে,
কৃপাচার্য্যে ; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি!
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি?
কে সে পার্থ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায়?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী!
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে ;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে!
   ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এস ছদ্মবেশে
না কয়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে!
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে!—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডু কুলে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যে দুঃশলা-পত্রিকা নাম
অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী

জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন।]

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদহ সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে! এ চিরবিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে!
হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে
কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে
যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,
করিয়া মিনতি স্তুতি নিষ্কৃতির আশে।
দিনু বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে

ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।'
বরিনু তোমারে সাধে, নরবর তুমি,
কৌরব! ঔরসে তব ধরিনু উদরে
অষ্ট শিশু,—অষ্ট বসু তারা, নরমণি!
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ!
কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে!
সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে।
অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে;
দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী
উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি;—
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে,
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে!
পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি। অখিল জগতে,
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে।
মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা;
নদপতি সিন্ধুনদ; বন কুলপতি
খাণ্ডব; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ! আর কব কত?
আপনি বাগ্‌দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা;
যমদম বল ভুজে! গহন বিপিনে
যথা সর্ব্বভুক্ বহ্নি, দুর্ব্বার সমরে!

তব পুণ্যবৃক্ষ ফল এই, নরপতি !
স্নেহের সরসে পদ্ম ! আশার আকাশে
পূর্ণশশী ! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি ! কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি , অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি ।
পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে
অসীম মহিমা তব ; কুল মান ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে !
তরুণ যৌবন তব ,—যাও ফিরি দেশে ;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী !
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে ; কর রাজ্য সুখে !
পাল প্রজা ; দম রিপু ; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি ;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সৎক্রিয়া যতনে !
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে । মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি ; প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী !
কি কাজ অধিক কয়ে ? পূর্ব্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কায়গত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী সদা আশীষে তোমারে !
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,

ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে।
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যার দেবব্রত রথী।
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চ'লি
হস্তিনায়, হস্তিপতি! অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, কত সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জাহ্নবীপত্রিকা নাম
নবমঃ সর্গঃ।

দশম সর্গ

পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশী নাম নাটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি!—
গত রাত্রে অভিনিনু দেব নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক, বারুণী
সাজিল মেনকা; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে;
বসিয়া কেশব ওই! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরুরবা প্রতি!'—হাসিলা কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত;
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে!
সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে!
শুন, নরকুলনাথ! কহিনু যে কথা

মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে;
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে?—
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে!
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী; ও চরণে রত
এ মনঃ!—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি!
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর! যদি কৃপা কর,
তাও কহ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে?
        শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে
হেমকূটে! এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে!
সহসা কাঁপিল গিরি! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সম!
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,'—
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে!
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে!

পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী মানবীর বাঞ্ছা! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন!
রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি;
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে,
দিনান্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি
কমল! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে!
চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি বিদ্যমান এবে
মোহান্তে! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে!'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা! নরকুল ধন্য তব গুণে!
এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পবান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা!

সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ ?—
সুরপুর চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে !
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি !
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা ? শুন, রাজা ! তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা ! রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে !
        কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ , সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে !
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে !
        উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে ! কি আর লিখিব ?
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে !
মরিতেছিনু, নৃমণি, জলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি ! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া !

দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে !
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে !
বাঁচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমার কহেন—'তুই হবি ফলবতী।'
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ !—নিবেদনমিতি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উর্ব্বশীপত্রিকা নাম
দশমঃ সর্গঃ।

একাদশ সর্গ

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাঁহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি,
হ্রেষে অশ্ব, গর্জ্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু, মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য,—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু। যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে।
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে।
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে।
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে,
নাশ, মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা,

এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে।
জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।
 হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
 কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?
কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি?
না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,

যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রান্তি তব ?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে ? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে ?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে ! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি ?
নরনারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান গায়েন সতত ।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে !
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আঃ মরি, কি সতী !
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ ! পৌরব-সরসে

নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া! ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা!
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?
    জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল!
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী। দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সময়ে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত্ত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে!
    কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?

জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি ? হায় রে কি পাপে ?
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ !—পার্থের সমীপে ?
কোথা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোথা ?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে ? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে ?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু ?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি ;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে !
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা ! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা ! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ !) নিঃসন্তানা করিল আমারে !
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি ! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে ! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে !—
হা প্রবীর ! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা যত্ন সয়ে,
এ উদরে ? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী

তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি ?
হা পুত্র ! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার ? এই কি রে ছিল তোর মনে ?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে ?
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে ? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি !—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে !
ক্ষত্র-কুলবালা আমি ; ক্ষত্র-কুল বধূ ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি ?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে ! যাচি চির বিদায়-ও পদে ।
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?" বলি !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জনাপত্রিকা নাম
একাদশঃ সর্গঃ ।

পরিশিষ্ট

বীরাঙ্গনা কাব্য ২১ খানি পত্রিকা যা সর্গে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল, ১১ খানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার পর তিনি আরও কয়েকটি পত্রিকা রচনায় হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি নিয়ে মুদ্রিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নৃমণি! তুমি, এ বারতা পেয়ে
দূতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হ'তে। পতি তুমি; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর! আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাত বার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি,
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে!

* * * *

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারু চন্দ্র; তারা-বৃন্দ তোমরা গো সবে।

আর না হেরিবে কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি ; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাস্নকির কণারূপ পর্যাঙ্কে সুন্দরী —
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
হে উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি ;
নদ, নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে,
স্নেহহীন এ কি কথা ? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে ? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
যদুবর ! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—

দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে।
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে!
অকূল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিনু? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। উষার হৃদয়ে
আশালতা আজি উষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজ।
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
ভবসুখে জলাঞ্জলি দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,

না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে এ দেশে নাথ, রবিকররাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি.
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর, তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই; বসি পৃষ্ঠাসনে

যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়! না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।

নলের প্রতি দময়ন্তী

পঙ্ক ছেদে বকি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

———

শব্দার্থ, টীকা, অন্বয়, ব্যাখ্যা ও অনুকল্প

প্রথম সর্গ ঃ দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

৭—মদকল করী—মত্ততাহেতু কলধ্বনিকারী হস্তী। তুঃ মদকল করী সদৃশ উন্মদ (বীরাঙ্গনা, ৭ম সর্গ, ২৫-২৬)। ৯—বাজী—অশ্ব। সং √বজ্ +ইন্ ১০—কিঙ্কর—অনুচর, ভৃত্য। সং কিম্+√কৃ+অ(ট্)। আশার ছলনে—তুঃ আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে। (আত্মবিলাপ ১-২)। ১২—হাদে—ওহে। লৌকিক বুলির ব্যবহার। মধুসূদন এমন অনেক অপাংক্তেয় শব্দকে কাব্যের আঙিনায় উচ্চাসন দিয়াছেন।

১৪-১৬ ধূলারাশি আদেশে—যেদিন প্রথম দুষ্মন্ত তপোবনে আসিয়াছিলেন সেদিন রথ, অশ্ব, গজ, পদাতিকের পদপাতে আকাশ ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই একটি দিনের স্মৃতি শকুন্তলার মনে চিরজাগ্রত। আকাশে ধূলারাশি দেখিলেই তিনি দুষ্মন্তের আগমন প্রত্যাশা করেন। উৎকণ্ঠিতা নায়িকার এই অপূর্ব রূপচিত্র মধুসূদন অঙ্কন করিয়াছেন।

তুঃ যতবার হেরি, দেব, আকাশ মণ্ডলে,
ঘনরবে
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে। (তৃতীয় সর্গ, ৭৬-৭৭, ৮০-৮১)

১৮—সই....বিষাদে—শকুন্তলার মনোবেদনায় ব্যথিত অনসূয়া বিলাপ করে।

১২—প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল হইয়াছে এমন। অশুদ্ধ প্রয়োগ। মুকুলিত, পুষ্পিত শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত। শুদ্ধ—প্রফুল্ল। সং প্র+√ফুল্ল+ত (ক্ত)।

তুঃ প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় রস সুখে। (মেঘনাদবধ, ৫ম সর্গ)

২৪—মরমরে—শুষ্ক পত্রাদির শব্দে। সং মৃ+অর (ক্ত)—ম (আগম)। এখানে স্বরভক্তি রূপে প্রয়োগ। মর্মরে>মরমরে।

২৭—সুধি—সুধাই, জিজ্ঞাসা করি।

ফুলপুঞ্জে—পাঠভেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ফুলকুলে।

৩০—পিকে—কোকিলকে। ৩৩ মদনের…মধু—প্রেমকামনার অধীন বসন্ত। অধীনে—পাঠভেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে অধীন।

৩৭—নিন্দিছেন—নিন্দা করিতেছেন। এই শ্রেণীর নাম ধাতুর ব্যবহার মধুসূদনের কাব্যে সুপ্রচুর।

৪৬—রসালের—আম্রবৃক্ষের। ৪৭—উন্মীলি—উন্মীলিত করিয়া। ৫০—কুরঙ্গীরে—হরিণকে।

৪২-৫৫—সলিল-সেক-সম্ভ্রমোদ্‌গতঃ নবমালিকাম্ উজ্‌ঝিত্বা বদনং মে মধুকরঃ অভিবর্ততে।…কথম্ ইতোঅপি আগচ্ছতি ? হলা পরিত্রায়েথাং মাম্ অনেন দুর্বিনীতেন দুষ্ট মধুকরেণ অভিভূয়মানাম্।

৫৩—শিলীমুখ—ভ্রমর। সং শিলী (শলা)+মুখ (বহু)। আক্রম—আক্রমণ কর।

৫৫—পুরুকুলনিধি—পুরুকুলশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দুষ্মন্ত।

৬২—তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি
নির্ঘৃণ তপতি বলীয় ত্বয়ি বৃত্তমনোরথায়া অঙ্গানি।

৬৩—প্রভঞ্জন—ঝড়। সং প্র√ভন্‌জ্‌+অন (র্তৃ)।
কৃতাঞ্জলিপুটে—করজোড়ে।

৮৫—অন্তরিত—মনোগত।

৮৯—যে নিকুঞ্জে ·সাথে—তুঃ এষা মনোরথপ্রিয়তমা সুকুসুমাস্তরণং শিলাপট্টমধিশয়ানা। (অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—তৃতীয় অঙ্ক)। ৯৭—পিতৃস্বসা—পিসিমা।

৯৮ তা না হলে—গৌতমী পূজা. ও দেবার্চনা লইয়া ব্যস্ত বলিয়া শকুন্তলার কথা কিছু জানিতে পারেন নাই। তিনি জানিতে পারিলে বিপদ ঘটিত।

১০০—বাকলে -গাছের ছালে। বল্কল > বাকল। নাহি অরে রুচি – অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার লক্ষণ।

১০২—না জানি · শূন্যমনে –তুঃ বিরহবিধুরা গোপী হায় শূন্যমনে (মেঘনাদবধ, ৫ম সর্গ)।

১০৩—পাসরি—প্রসারিত করিয়া। ১০৮-১০৯ কে কারে—মধুসূদনের কাব্যে এই ধরণের উক্তির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ১০৮ –কে কবে—পাঠান্তর। ১ম ও দ্বিতীয় সংস্করণে হায়রে। ১০৯—তা কারে—পাঠান্তর। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে—কাহারে।

১১০-১১—বিরামদায়িনী নিদ্রা –তুঃ উত্তরিলা ধীরে, বিরামদায়িনী নিদ্রা রজনীর সখী (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—১ম সর্গ) বিরামদায়িনী নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে। (মেঘনাদবধ কাব্য—৫ম সর্গ)। ১১৪—দ্বিরদ রদ—গজদন্ত। ১১৬—বিদ্যাধরী গঞ্জিনী কিঙ্করী—বিদ্যাধরীকে গঞ্জনা দিতে পারে এমন দাসী। ১২০—অলকাসদনে—কুবের পুরীতে।

১২৬—অমূল্য—পাঠান্তর। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে অতুল। ১২৭—রাজীব-পদ্মের ন্যায়। সং রাজী+ব। ১২৯—দেবেন্দ্র-সদৃশ—দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়। ১৩৬—কুশাসনে—কুশনির্মিত আসনে। ১৩৯—রোহিণী—রোহিণীনক্ষত্র। ইনি চন্দ্রের প্রিয়তমা স্ত্রী বলিয়া

প্রসিদ্ধ। ১৪১-৪২—জনক··যোরে—তুঃ

যেনকা অপ্সরারাণী ব্যাসের ভারতী।
প্রসবি ত্যজিলা যারে, ভারত কাননে
শকুন্তলা সুন্দরীরে। (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

১৪৭—এ মনে—পাঠান্তর। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এমনে।

১৫৯—পরাণ—পরাণে সকত।

১৬২-৬৩ মজ্জমান ··তৃণে—তুঃ A drowning man catches at a rush or straw.

দ্বিতীয় সর্গ ঃ সোমের প্রতি তারা

৩—কিন্তু ভাগ্য দোষে—তারা চন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত। অনুরাগের জন্য তিনি চন্দ্রের পদপ্রান্তে দাসী হইবার বাসনা পোষণ করেন। কিন্তু নিয়তির এমন পরিহাস যে তিনি চন্দ্রের গুরুপত্নী। ৫-কি লজ্জা—সম্পর্ক-বিরুদ্ধ আসক্তির কথা প্রকাশ করিতে তাঁহার অপরিসীম লজ্জা। ৭-১০ হস্ত দাসী···লতা—তারা গুরুপত্নী হইয়াও চন্দ্রকে হৃদয় অর্পণ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্ক বিরুদ্ধ আসক্তির কথা লেখনী কেমন করিয়া লিখিতে পারিল—ইহাই তারার জিজ্ঞাসা। লিখিতে যে পারিয়াছে তাহার কারণ কলম হস্তদ্বারা চালিত হয় বটে, কিন্তু হস্ত আবার মনের দ্বারা চালিত হয়। তারার আসক্তি মনে—সুতরাং উহা সেইজন্যই লজ্জান্বিত হইয়াছে। বজ্রের আগুনে বৃক্ষের শীর্ষদেশ পুড়িয়া গেলে সেই বৃক্ষ-আশ্রিত লতাও তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় না। সেইরূপ মন যদি পুড়িয়া যায়, তবে সেই মনের অধীন হস্ত এবং হস্তের অধীন লেখনীও দগ্ধ হইয়া যাইবে। ১১-১২—হেস্মৃতি···প্রদীপ—তুঃ Bad

deeds are better done in dark ১১-১৩ হে স্মৃতি…তারা।—আলোকের সম্মুখে অর্থাৎ প্রকাশ্যে দুষ্কার্য সাধন করা যায় না, তাহার জন্ত অন্ধকার প্রয়োজন। তারা যে সম্পর্ক-বিরুদ্ধ আসক্তির কথা প্রকাশ করিয়েছেন সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব করিয়া তুলিতে হইলে তাঁহাদের বাস্তব সম্পর্ক ভুলিতে হইবে।

২৬—অন্তরিত—আচ্ছন্ন, আবৃত। তুঃ কাম—হায়, বিষম অনল অন্তরিত (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য : তৃতীয় সর্গ।)

৩১—মীনধ্বজ—কামদেব, ইহার ধ্বজা মীনাঙ্কিত।

৩৮—৪১ যেদিন প্রথমে…উল্লাসে—তুঃ ইহারই অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপে'র অন্তর্গত দেবযানীর প্রথম দর্শনের স্মৃতিপরিকল্পিত। ৪৪—দর্পণে—আয়নায় সং √দৃপ্‌+অন (ণ্‌)। ৪৩ বিনাইনু—বেণীরচনা করিলাম। নামধাতু। ৪৪—কুন্তলে—খোঁপায় ৪৫—ঘৃণিনু—ঘৃণা করিলাম। নামধাতু। ৪৭ কাঁচলী—বক্ষোবন্ধনী, স্তনাবরক বস্ত্র। সিঁথি—সীমন্ত। কঙ্কন—কাঁকণ ৭৮ কাঞ্চী—মেখলা, কোমরের অলঙ্কার বিশেষ। সং √কান্‌চ্‌+ই (নে)। কুণ্ডল—কানের অলঙ্কার, বলয়। সং কুন্‌ড্‌+অল (ণ্‌)। কটিদেশে—কোমরে। ৪৯—মৃগমদে—কস্তুরীকে। মধুরে—বসন্তকে। ৫৯—নিগম—বেদ। নি+√গম্‌+অ। তন্ত্র—উপাসনা বিধি, তন্ত্রশাস্ত্র। √তন্‌+ত্র (ণ্‌)। ৬০ মুরজ—মৃদঙ্গ (আলো মৃদঙ্গ, মুরজ মুরলী মধুরা। রবীন্দ্রনাথ) ৬০ -তুম্বকী—একতারা। ৬২ ভ্রান্তি—পাঠান্তর। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ—ভ্রান্তা। ৭৪— আচমন—আঁচান। সং আ+√চম্‌+অ। ৭৮—হরীতকী—পীতবর্ণের কষায় ফল। হরি (পীতবর্ণ)+ইত (প্রাপ্ত) ২য়া তৎপুরুষ +ক+ঈ। ৮২—বরাঙ্গ—সুন্দর দেহ। ৮৯—অবচরি—চয়ণ করি। ১০২—এ বর…অভিমানে—অভিমানে আমার এই সুন্দর বর্ণ কালিমাবর্ণ হইয়া

গিয়াছে। ১১৬—গঞ্জিতাম—গঞ্জনা দিতাম। ১২০—স্তিতি অশ্রুজলে—তুঃ ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে তিতি অশ্রুনীরে চলে সবে (মেঘনাদবধ কাব্য) ১২৪—যবে—পাঠভেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে—যদি। ১৩০-৩৯-হায়রে ··এস্থানে—মধুসূদনের কাব্যে বহুল ব্যবহৃত উক্তি। ১৪১-৪২ প্রেম উদাসীনী আমি—তুঃ প্রেম উদাসীন, যদি তুমি, গুণমণি (পঞ্চম সর্গ, বীরাঙ্গনা)

তৃতীয় সর্গ ঃ দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

২৪—অবধান—মনোযোগ সহকারে শ্রবণ। অব+√ধা+অন (ভা)। সুচিলা · কারাগারে-কংস নারদের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার ভগিনী দেবকীর গর্ভজাত পুত্র কংস হন্তারক হইবে। এই কথা জানিয়া তিনি দেবকী ও তাঁহার স্বামী বসুদেবকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কারাগারেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। ৩০—কুস্থলে—এখানে কারাগারে। ৩৪—স্বনিলা—শব্দ করিল। ৪০—বৃষ্টিলা—বর্ষণ করিল। নামধাতু। ৪৪—গোপরাজ গৃহে—নন্দের গৃহে। ৪৭—গোপ দম্পতি—নন্দ এবং যশোদা। ৫১-৫২ কি পুতনারে—কংসাদেশে পুতনা কৃষ্ণকে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণ স্তন পান করিতে গিয়া তাহার রক্তপান করিয়া পুতনাকে বধ করেন।

৫২-৫৩ কালনাগ ·ভলে ?—কালিন্দীর বিষাক্ত জল পান করিয়া গোধেনুসহ গোপগণ হতচেতন হইয়া পড়ে। কৃষ্ণ তখন কালীয় নাগকে দমন করেন। সেই সময় কালীয় নাগ তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল। ৫৪—৫৫ বাসব যবে...প্রলয় প্লাবনে—গোপগণ চিরকাল ইন্দ্রযজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট রাখিত। কারণ ইন্দ্রের আদেশেই মেঘ জল দান করে। অতি ও অনাবৃষ্টি যাহাতে না হয় তাহার জন্যই

তাহারা ঐ যজ্ঞ করিত। একবার কৃষ্ণের প্ররোচনায় তাহারা ইন্দ্রযজ্ঞ পরিহার করিলে ইন্দ্র রুষ্ট হইয়া অতিবৃষ্টির দ্বারা প্রলয়-প্লাবনের সৃষ্টি করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে উদ্ধার করিবার জন্ত গোবর্দ্ধন পর্বত তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরেন। তাহার ফলে ঐ গোবর্দ্ধন পর্বতের নীচে অবস্থান করিয়া গোপগণ জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

৫৫—জলসার—জলধারা। গোবর্দ্ধন—বৃন্দাবনস্থ পাহাড় বিশেষ। ৬৪—পিতৃ অরি--পিতার শত্রু, এখনে কংসরাজা। ৭১—শিখিপুচ্ছশিরে—তুঃ শিখিপুচ্ছচুড যেন মাধবের শিরে (মেঘনাদবধ কাব্য) ৭১-৭৪ শিখি·· রাজীব চরণে—

তুঃ বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা,
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য)
পীতধড়া পীতাম্বরে অধরে মুরলী (মেঘনাদবধকাব্য,
তৃতীয় সর্গ)

৭৫—যোগীন্দ্র ··পদ্ম—মহাদেবের হৃদয় সরবরে পদ্ম স্বরূপ। ৭৮—শক্র ধনুঃ চূড়ারূপে।

তুঃ স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধনু রতনে খচিত তনু
চূড়া শিরোপর,

৮০-১—ভ্রান্তিমদে···দাসীরে—তুঃ ওই দেখ, ধূলারাশি উঠিছে গগনে
ওই শোন কোলাহল, পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে।
(দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, বীরাঙ্গনা)

৮৮—শিখণ্ডী—ময়ূর। শিখণ্ড—ময়ূরপুচ্ছ। শিখিন্+√অম্+ড (র্তৃ)।

শিখণ্ড···যাঁর—ময়ূর পুচ্ছই শ্রীকৃষ্ণের শিরঃ ভূষণ।

১৪৪—গরুড়-ধ্বজে—গরুড়-ধ্বজ-রথে। পাঞ্চজন্ত—কৃষ্ণের শঙ্খ।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত পঞ্চম নামক অসুরের অস্থিদ্বারা নির্মিত বলিয়া। ১০৭—বৈনতেয়—বিনতানন্দন গরুড়। ১০৮—হরিল অমৃতরস··· চন্দ্রলোকে—অমৃত রক্ষার জন্য দেবগণ তাহা চন্দ্রলোকে লুকাইয়া রাখেন। কিন্তু গরুড় তথা হইতে অমৃত হরণ করিয়া লইয়া আসেন।

চতুর্থ সর্গ : দশরথের প্রতি কেকয়ী

১-আজ পাঠভেদ। প্রথমও দ্বিতীয় সংস্করণে আজি। ৭-মুকুল মালা—তুঃ খচিতমুকুলে ফলে পল্লবের মালা (মেঘনাদবধকাব্য) ৪-১৫ পুরবাসী যত বীণাধ্বনি। তুঃ বাল্মীকি রামায়ণ—

সিক্তরাজপথাং কৃৎস্নাং প্রকীর্ণকমলোৎপলাম্।
পতাকাভির্বরার্হাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্।
সিক্তাং চন্দনতোয়ৈশ্চ শিরঃস্নাতজনৈর্বৃতাম্॥
মাল্যমোদকহস্তৈশ্চ দ্বিজেন্দ্রৈরভিনাদিতাম্।
শুক্লদেবগৃহদ্বারাং সর্ববাদিত্রনাদিতম্॥
সম্প্রহৃষ্টজনাকীর্ণাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতাম্॥
প্রহৃষ্টবরহস্ত্যশ্বাং সম্প্রণর্দিতগোবৃষাম্।
হৃষ্ট প্রমুদিতৈঃ পৌরৈরুচ্ছ্রিতধ্বজ মালিনীম্॥

১৩ হুলাহুলি—কোলাহল। তুঃ রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি (মেঘনাদবধ কাব্য।)

১৪ শারিকী—শারিকা সরুত। মেঘনাদবধেও এই ব্যবহার আছে।

২০ ঝাঝরি—কাংস্যনির্মিত বাজনা, কাঁসর ; তুঃ বাজিছে ঝাঁঝরী [illegible]কাব্য) ২১ বরাননে—কাহারও কল্যাণের জন্য [illegible]

শাস্ত্রীয় কর্মে। ১-৩৪—মূল বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার নাটকীয় কৌশল লক্ষণীয়। ৪৩-৪৬ যথার্থ...দেখ ভাবি মনে। তুঃ বাল্মীকি রামায়ণ

যদি দত্বা বরৌ রাজন্ পুনঃ প্রত্যাহৃতপ্যসে
ধার্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি
যদা সমেতা বহবস্ত্বয়া রাজর্ষয়ঃ সহ।
কথয়িষ্যন্তি ধর্মজ্ঞ তত্র কিং প্রতিবক্ষ্যসি॥

৪৭-৫৫—অপগত যৌবন বেদনা। ৪৮ বর্তুল—গোলাকার। ৫৭-৫৯—সেবিনু মোর কাছে?—দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বর দান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। শম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধে দশরথের দেহ ক্ষত হইলে কৈকেয়ী শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তোলেন। সেই সময় তিনি একটি বর দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। দ্বিতীয়বার, তিনি নখ-ব্রণে কাতর হইলে কৈকেয়ী সেবার দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলেন—ইহাতে তিনি দ্বিতীয় বর দান করিতে প্রতিশ্রুত হ'ন। কৈকেয়ী বলেন যে তিনি সময়মত বর চাহিয়া লইবেন।

৫৯-৬০ কামমদে তুমি—তুঃ বাল্মীকি রামায়ণ—

তং মন্মথশরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্।
উবাচ পৃথিবীপালং কৈকেয়ী দারুণং বচঃ॥

৬২—কামীর·· জগতে—তুঃ কামমদে রত যে দুর্মতি
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
(তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য, ৪র্থ সর্গ)

৬৬—পথী—পথিক। ৬৬-৬৮ এ কুপথে দেব দিনমণি!—চন্দ্রে *কলঙ্ক চিহ্ন আছে, কিন্তু সূর্যে তাহা নাই। কিন্তু সূর্যবংশপতি দশরথ* যেভাবে প্রবঞ্চনা করিতেছেন তাহার ফলে তিনি নিজেকে কলঙ্কিত করিলেন। ফলে সূর্যও কলঙ্কিত হইল। ৭০-৭৩—তবে কেন·· কৌশল্যা-নন্দন-রাঘবে?—তুঃ ন ত্বং ধর্মং পরিত্যজ্য রাঘবং রাজ্যেঽভিষিঞ্চ চ।

৮৫—অভীষ্ট—বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত। ৯৪—কাদম্বিনী—মেঘপুঞ্জ। কাদম্ব+ইন+ঈ। ৮৮—কে পারে· ·কেশরীরে—তুঃ কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বিতংসে। (মেঘনাদবধকাব্য) ৮৯—বিতংসে—ফাঁদে। ৯৪ গম্ভীরে···কাদম্বিনী—অনুরূপ উক্তি মেঘনাদ বধেও আছে। ৯৬-৯৮ পথিকে . . কুলপতি। তুঃ বাল্মীকি রামায়ণ

চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহনক্ষত্রাইনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্ব্বা সরাক্ষসা॥
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ূর্ভাবিতং তব॥
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরং মম দদাত্যেষ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ॥

৯৮—পরম পতি—তুঃ পরম অধর্মচারী নিশাচর-পতি (মেঘনাদ-বধ: ২য় সর্গ।) ১১৭-১৮ বামদেশে কৌশল্যা· তুমি। তুঃ বাল্মীকি রামায়ণ—

সহ কৌশল্যয়া নিত্যং রন্তুমিচ্ছসি দুর্মতে।

১২২ পিতৃমাতৃহীন পুত্রে—পিতামাতা বর্তমানেও দুর্ভাগ্যযুক্ত বলিয়া এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে। ভরত মাতৃপিতৃহীনের ন্যায়।

পঞ্চম সর্গ: লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা

২—বিভূতি-ভূষিত—ভস্ম-মাখা। ৬ মঞ্জু—সুন্দর। √মন্জ্+উ (তুঁ)। মঞ্জুকেশী—সুন্দর কেশ বিশিষ্ট। ৮ বরাঙ্গ—সুন্দর দেহ। ১৬ মঞ্জুল-মঞ্জুলে—বেতকুঞ্জে। ১৭ ত্যজিলা হে—পাঠভেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে— ত্যজি তুমি। ১৮ হেমাঙ্গ—স্বর্ণবর্ণ

দেহ বিশিষ্ট। মৈনাক—মেনকা বা হিমালয় পত্নীর পুত্ররূপে বর্ণিত পৌরাণিক পর্বতবিশেষ। হেমাঙ্গ মৈনাক—তুঃ হিরণ্যাভং মৈনাকমুবাচ গিরিসত্তমম্ (বাঃ রামায়ণ)। দ্বিতীয় তপন রূপে নীলসিন্ধুজলে মৈনাক ভাসিল (সূর্য ও মৈনাক, মধুসূদন)। ১৯ কার ভয়ে...সাগরে—ইন্দ্র পক্ষচ্ছেদ করিবে এই ভয়ে মৈনাক সাগরে আত্মগোপন করিয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মণ কাহার ভয়ে এই বনসাগরে আশ্রয় লইয়াছেন? ২৫—বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রপুরী। শচীকান্ত—ইন্দ্র। ২৬—ভীম-রথী—প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা, এখানে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ। ২৮—ত্রিলোকে—স্বর্গে, মর্ত্তে ও পাতালে। ৩০—শূর—বীর। চামুণ্ডা—দুর্গাদেবীর রূপ বিশেষ। এইরূপে দুর্গা চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলেন। এখানে ইনি লঙ্কার রক্ষয়িত্রী দেবী। ৩৫—অলকা—ধনাধিপতি কুবেরের পুরী। রাবণ কুবেরকেও জয় করিয়াছিলেন। ৩৬—কুহকে—মায়ায়। √কুহ +অক (ক্তৃ)+এ। ৩৮—মণিযোনি—মণির উৎপত্তিস্থল। ৩৯—প্রেমউদাসীন—তু: দেহ পদাশ্রয় আসি, প্রেম উদাসিনী আমি (সোমের প্রতি তারা)। ৪১—রামাকুলে—পাঠভেদ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে রমাকুলে। ৪৩—অনিমেষে রূপ তার ধরি—তুঃ অহং প্রভাবসম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী (বাল্মীকি রামায়ণ)।

৪৪—কামরূপা অমি নাথ—তুঃ অহং শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী। ৪৫—পারিজাত—সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন স্বর্গীয় বৃক্ষ। পারিণ (সমুদ্র)+জাত (ধৌতৎ)। ৪৭—কিন্নরী—অশ্বের ন্যায় মুখ এবং মানুষের ন্যায় দেহবিশিষ্ট দেবলোকের গায়িকা। কিম্+নর+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)। ৫১—৫৫ সোপানখচিত...পাখী সুমধুর স্বরে। তুঃ

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ,...

ফুলিছে ফলি ফালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা,
মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলি-লহরী, মরি!

৫২—মরকতে—পান্নায়। মরক্+√তৃ +অ (র্ত)। পদ্মরাগ—চুনি। ৫৪—সুকল—সুমিষ্ট। ৬৭-৭৩—ঠিক বিপরীত চিত্র রহিয়াছে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায়। (দ্রঃ ৪৫—৪৯)। ৭০—বিপিনজনিত—কাননে-উৎপন্ন। ৭৮-৭৯ খুচাইয়া বেণী…বাঁধি কে কবরী—প্রিয়তমের রূপের সঙ্গে মিলাইয়া নিজের রূপের পরিবর্তন। ৮২-শমী—শমীবৃক্ষ। ৮৬ চাহে যথা…সূর্যের পানে—প্রেমের একনিষ্ঠতার ব্যঞ্জনা। ৯২-৯৩ যথায় রাখিতে…ভালে যথা— অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক। ৯৩—হব্য—হোম। ১০৩—দেখিব… স্বজনে—তুঃ Love is but a dreaming (মধুসূদন)। ১৩৫-১৪৮ বিখ্যাত নাথ… সূর্পণখা—তুঃ অহং শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।

রাবণো নাম মে ভ্রাতা যদি তেশ্রোত্রমাগতঃ
প্রবৃদ্ধনিদ্রশ্চ সদা কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ
বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ।

১০০-১১০ কত যে বয়স…গিয়াছেন—রূপযৌবনের প্রতীক।
১২৪—২৫—মারি, বালাই, লইয়া—লৌকিক বুলির প্রয়োগ।

ষষ্ঠ সর্গ

১—ত্রিদশালয়—অমরাবতী, স্বর্গ। ৬—সুরবালা—দেববালা, স্বর্গের কুমারী। পীন—প্রবৃদ্ধ, স্থূল। √প্যায়্ + ত (ক্ত)। ৮—স্বয়ংপ্রভা—স্বীয় জ্যোতিতে দীপ্তিমতী। ৭—১২ ঘৃতাচী…কেহ গায় সুখে—তুঃ

ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা পূর্ব্বচিত্তিঃ স্বয়ম্প্রভা।
উর্বশী মিশ্রকেশী চ বপুর্গৌরী বরূথিনী॥
গোপালী সহজন্যা চ কুম্ভযোনিঃ প্রজাগরা।
চিত্রসেনা চিত্রলেখা সহা চ মধুরস্বরা॥
এতাশ্চান্যাশ্চ ননৃতুস্তত্র তত্র সহস্রশঃ।
চিত্ত প্রসাদনে যুক্তাঃ সিদ্ধানাং পদ্মলোচনাঃ॥
[বনপর্ব—অষ্টত্রিংশ ২৯—৩১]

তুঃ কোথা সে উর্বশী, রূপে ঋষি মনোহরা
চিত্রলেখা—জগৎ জনের চিত্তে লেখা,
মিশ্রকেশী—যার কেশ কামের নিগড়।

(মধুসূদন)

৭—সুউরু রম্ভা—তুঃ আইলেন রম্ভা যাঁর উরুর বর্ত্তুল প্রতিকৃতি ধরি (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—দ্বিতীয় সর্গ) ৯—দিবে—স্বর্গে। উর্বশী…শশিকলা দিবে—স্বর্গে উর্বশী যেন কলঙ্কহীন শশি। পরমাশ্চর্য রূপের ব্যঞ্জনা। ১০—নিবিড় নিতম্বী—প্রশস্ত পাছা। ১০-১১—চিত্রলেখা চারুনেত্রা—তুঃ আইলা চারু চিত্রলেখা সখী (তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, দ্বিতীয় সর্গ) ১৪—মন্দার মণ্ডিত বেণী—নন্দন কাননের, মন্দার কুসুম ভূষিত বেণী। তুঃ সুবিম্ব অধরা, সুশোভিত কবরী মন্দারে (তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য।)

১৫—কস্তুরী—মৃগনাভি। ২৬—সরোরোধ:—সরোবরের তীর।

৪০—কৃতাঞ্জলি-পুটে—করজোড়ে। কৃত+অঞ্জলি (বহু)।

৪২—কেন যে···কপালে—মধুসূদনের বহুব্যবহৃত পংক্তি।

৪৫—৪৭ রবি পরায়ণা···রহস্য কথা—পদ্ম সূর্যপ্রিয়া, কিন্তু বাতাস তাহার কাছে গিয়া প্রেমালাপন করে। অর্থাৎ রবি তাহার প্রাণপতি হইলেও সমীরণ তাহার পরিমল হরণ করে এবং ভ্রমর তাহার মধুহরণ করে। ইঙ্গিতটি লক্ষণীয়। অর্জুন দ্রৌপদীর প্রাণপতি হইলেও, অপর চারি ভ্রাতাও তাঁহাকে উপভোগ করেন। দ্রৌপদীর বহু স্বামীত্বের ইঙ্গিত এবং অর্জুনের প্রতি তাঁহার অন্তর-ভালবাসা লক্ষণীয়। তুঃ নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া প্রেমের রহস্য কথা—(মেঘনাদবধ কাব্য, পঞ্চম সর্গ)। গৌরব সরসে নলিনী! অলির সখী, রবির অধিনী, সমীরণ প্রিয়া (জনা পত্রিকা)। ৫১—কারে নিন্দি—অপরকে দোষ দিবার কিছু নাই—ইহাই অদৃষ্টের পরিহাস। ৫৪-৫৫—নলিনী মলিনী·· তোমার বিহনে—বিরহার্তি লক্ষণীয়। ৬০-৬১—আঁধার বিশ্ব ···মহারণ্য যেন—তুঃ

আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে।
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে॥ (মেঘনাদবধ
কাব্য, তৃতীয় সর্গ)

বহ্বাশ্চর্যমিদঞ্চাপি বনং কুসুমিত দ্রুমম্
ন তথা রমণীয়ং বৈ তমৃতে সব্যসাচিনম্
নীলাম্বুদচয়প্রখ্যং মত্তমাতঙ্গ বিক্রমম্
তমৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কাম্যকং নাতিভাতি মে॥···
নৈব নঃ পার্থ! ভোগেষু ন ধনে নোত জীবিতে
তুষ্টির্বুদ্ধির্ভবিত্রী বা ত্বয়ি দীর্ঘপ্রবাসিনি।

(ব্যাস-মহাভারত)

৬৫—এই জানি···যানি মনে—বীরাঙ্গনার নারীদের মূল কথা ইহার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই মনের মানাকেই তাঁহারা সর্বপ্রাধান্য দিয়াছেন। ৬৯—যজ্ঞানলে···যজ্ঞসেনী—দ্রুপদ রাজার যজ্ঞানল হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য দ্রৌপদীকে যাজ্ঞসেনী বলা হয়।

৭৪—বৈদেহির সুকাহিনী—জনকের সভায় রামচন্দ্র হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে লাভ করেন। এখানে ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করিবার মত। অর্জুনও লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। ৮০—কোদণ্ড—ধনু। ৮১—বলীশ্রেষ্ঠ—শিবধনু ভঙ্গ করা একমাত্র অর্জুনের দ্বারাই সম্ভব। ৮২ বৈদর্ভী—দময়ন্তী। ৮২-৮৩ ধরিতাম ফাঁদে রাজহংসে—বিদর্ভরাজ-কন্যা দময়ন্তীর কাহিনী হইতে তিনি জানিতে পারেন যে দময়ন্তী রাজহংসের সাহায্যে প্রিয়তম নলের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনিও তাঁহার অনুসরণে রাজহংস ধরিয়া পত্রপ্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন। ৮৪—ঘুংঘুর—নূপুর। ৮৬-৮৭ রাজহংসপতি ···শূন্যপথে—কালিদাসের মেঘদূতের অনুসরণে তিনি হংসদূত প্রেরণ করিয়াছেন। ৯২-৯৪ বাহন যাঁহার তুমি···নাথের চরণে।—মেঘ ইন্দ্রের বাহন; সেইজন্য ইন্দ্র মেঘকুলপতি। ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম। দ্রৌপদী নিজেকে অর্জুনের স্ত্রী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তিনি ইন্দ্রের পুত্রবধূ। সেইজন্য মেঘ দেখিলে তিনি সঙ্গতভাবেই আবেদন করিতেন যে ইন্দ্র-পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে তিনি যেন অর্জুনের নিকট পৌছাইয়া দেন। যেভাবে তিনি জলধারা বহন করেন, সেইভাবে তাঁহাকেও যেন বহন করেন। ৯৭—ঘনমণি—মেঘ। ৯৮—মোর সে-ভিন্ন পাঠ। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে—আমার।' ১০০-জনরব—জতুগৃহদাহে পাঁচজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের দগ্ধাবশিষ্ট থাকায় কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব

পুড়িয়া মারা গিয়াছেন এমন জনশ্রুতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জনরব বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। দ্রৌপদীর মুখে এই উক্তি অতিশয় সঙ্গত। কারণ দ্রুপদরাজ স্বয়ং এই জনরবের উল্লেখ করিয়াছেন। তুঃ

জতু গৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন।

হেন মতে ধ্বনি কৈল ঘোষে সর্বজন। (মহাভারত, আদি, কাশীরাম) ১০৩-বিধবা…যৌবনে—বিবাহ না হইলেও দ্রৌপদী নিজেকে অর্জুনের পত্নী বলিয়াই জানেন ; তাই তাঁহার মৃত্যুসংবাদে তিনি নিজেকে বিধবা মনে করিয়াছেন। ১০৮-১০৯ আঁধার দেখিনু চৌদিকে——দ্রৌপদী তাঁহার দেহমনআত্মা সকলই অর্জুনের নিকট নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু সে অর্জুন মৃত, তাঁহাকে অন্য পুরুষের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিতে হইবে। এইকথা ভাবিয়া স্বয়ম্বরসভা তাঁহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন।

১১১-১১২ খসিয়া…বজ্রাগ্নি সদৃশ—লৌকিক বুলির প্রয়োগ। ১১৯—ভস্মরাশি মাঝে…বৈশ্বানর রূপে—অর্জুনের তুলনায় অপরাপর রাজাগণ ভস্মস্বরূপ এবং অর্জুন অগ্নিস্বরূপ। কিন্তু তিনি গুপ্ত অগ্নি, কারণ লক্ষ্যভেদের সময় মহাপরাক্রমশালী অর্জুন ছদ্মব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তুঃ

মহাবীর্য যেন সূর্য ঢাকিয়াছে মেঘে।

অগ্নি-অংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিত নাগে। (কাশীরাম)

১২৫-২৬—ফুলমালা দিয়ে…নিবারিলা তুমি—অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিলে দ্রৌপদী ফুল, চন্দন ও মাল্য লইয়া তাঁহাকে বরণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জুন তাঁহাকে বরণ করিতে নিরস্ত করেন। তুঃ

হাথে দধি পাত্র মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী।

পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি॥

দধি মাল্য দিতে পার্থ কৈল নিবারণ।

(কাশীরামদাস, মহাভারত, আদি পর্ব)

১২৮—এ বিষম তাপে....এ দাসী ?—দ্রৌপদী যদি স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনকে বরণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পঞ্চ স্বামীর উপাসনা করিয়া বিষম বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত না।

১৩০—লক্ষ রাজ…তোমারে—দ্রৌপদী অর্জুনকে বরণ করিলে সভাস্থ নৃপতিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং স্বয়ম্বর-সভা ভঙ্গের পর সমবেত নৃপতিবর্গের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ হয়। ১৩৩—সাহসিলা এ দাসীরে—অর্জুন একা লক্ষ রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া তিনি ভীত হইয়া পড়েন। ভীত হইয়া দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন—‘একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি’ (কাশীরাম দাসের মহাভারত, আদি পর্ব) তখন অর্জুন তাঁহাকে সাহস প্রদান করেন। তুঃ

অর্জুন বলিলা তুমি রহ মোর কাছে
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রক্তি পাছে। (মহাভারত, আদি)

১৩৮-১৩৯ আশারূপে…চন্দ্রমুখ হেরি—তুঃ অর্জুন বলিলা তুমি রহ মোর কাছে ইত্যাদি। ১৪৫-৪৬ কি লিখি ·অশ্রুনীরে—অতীতের কথা স্মরণ করিয়া দ্রৌপদীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। সুতরাং তিনি যে কী লিখিতেছেন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। ১৫৫-৫৬ ত্যজিলে দেব…পদযুগ—মর্ত্যচেতনা ও দৃষ্টিপিপাসা লক্ষণীয়! ১৬০ এ কাননে—কাম্যক বনে। এখানে থাকাকালীন অর্জুন দেবগণ কর্তৃক আহূত হইয়া অস্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ১৬৬—কামদা—অভীষ্ট দাত্রী। ১৬৪-কামধুকে—কামদাত্রী অর্থাৎ অভীষ্ট দাত্রী অমরাবতীকে। ১৭৭-৩ বিকট বনে—কাম্যক বনে! তুঃ বড়ই দুর্গম বন (মহাভারত)। ১৮০ ধৌম্য—পাণ্ডবদের পুরোহিত। ইনি পাণ্ডবদের সহিত বন-গমন করিয়াছিলেন। ১৮২-মধ্যম—ভীমের কথা বলা হইয়াছে। অনুজদ্বয়—নকুল ও সহদেব।

পাণ্ডবকুল-ভরসা—তুঃ রাক্ষস ভরসা (মেঘনাদবধ) Hope of Troy-এর অনুসরণে গঠিত। ১৯২-মহেষাস—মহাধনুর্দ্ধর। ১৯৮-এ সঙ্গীত···সঙ্গীতধ্বনি—তুঃ।

মারিবে বীরেন্দ্র—
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
·· ···আশা মায়াবিনী·

পথে; ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে। (মেঘনাদবধ কাব্য)

১৯৯—২০০ কে শিখায় অস্ত্রী ··কুল-গুরু তুমি?—অর্জুনকে অস্ত্র শিক্ষা দিবার মত কেহ নাই। অথচ তিনি স্বর্গে অস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়াছেন—ইহা কি একটা ছলনা মাত্র? ২০০—২০২ এই সুরদলে··· খাণ্ডব রণে।—স্বর্গে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা অসম্ভব এইজন্য যে যাঁহাদের নিকট তিনি অস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদেরকেই তো অর্জুন খাণ্ডবদাহনকালে পরাজিত করিয়াছিলেন। ২০১—গাণ্ডীব—অগ্নির অনুরোধে এই ধনু বরুণ অর্জুনকে দান করেন। এই অস্ত্রের সাহায্যে অর্জুন খাণ্ডববনে দেবতাগণকে পরাজিত করেন। ২০২—জিনিলা একাকী—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশধারী অর্জুন সভায় সমবেত লক্ষ নৃপতির সহিত একাকী যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। ২০৪—২০৫ নিপাতিলা ভূমিতলে···কিরাতেরে।—হিমালয়ে অর্জুন যখন তপস্যা করিতেছিলেন সেই সময় মহাদেব কিরাতের বেশ ধারণ করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন।

কিন্তু এঃ মধুসূদন অবশ্য মহাভারতের কাহিনীর কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মহাভারতে অর্জুনই ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ২০৫—এ ছলনা— অর্জুনের এবম্প্রকার অসাধারণ শৌর্য-বীর্য সত্ত্বে

যমপুরে গমন একটি অছিলা মাত্র। ২০৯—ভ্রাতৃ রবে—চারি ভ্রাতা হওয়া উচিত ছিল।

২২৩ পত্র বহ··এ বলে—দ্রৌপদীর অধিকার-চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে।

———

সপ্তম সর্গ

১-অধীর—(অমঙ্গল আশঙ্কা সূচক)। ৫ দেবালয়ে—(স্বামীর মঙ্গল কামনার জন্ম প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে)। রাজোদ্যানে—(মনকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে) ৭ আবরে-আবৃত করে। ৮-জলে শররাশি (শাণিত শরের ঔজ্জ্বল্যে) ১০—সিংহনাদ—(আক্রমণকারী বীরদিগের আস্ফালন) শঙ্খধ্বনি—(যুদ্ধ আহ্বানের ব্যঞ্জনা।) ১১-কাঁপে হিয়া (ভয়াকুল চিত্ততা ব্যঞ্জক)। যাই পুনঃ ফিরি (অস্থির চিত্ততার রূপ।) ১২-স্তম্ভের আড়ালে—তিনি কৌরবকুল বধূ বলিয়া সকলের সম্মুখে বাহির হইতে পারেন না, তাই আড়াল হইতে যুদ্ধের বার্তা শ্রবণ করেন। ১৩-সঞ্জয়ের মুখে-ব্যাসের প্রসাদে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু পাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে প্রত্যহ যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করিতেন। ১৫ কি যে শুনি (বিহ্বল চিত্ততা ব্যঞ্জক) ১৮-নয়ন-আসারে। তুঃ হায়রে ভিতিছ নাথ, নয়ন-আসারে। (ষষ্ঠ সর্গ, বীরাঙ্গনা) ১৯-নাহি সরে কথা—(আশঙ্কায় বিহ্বল চিত্ততাব্যঞ্জক) ২০ সান্ত্বনিতে—সান্ত্বনা করিতে। তুঃ সান্ত্বনি পরাণে (ষষ্ঠ সর্গ, বীরাঙ্গনা।) ২৩-তিতি অশ্রুনীরে—মধুসূদনের কাব্যে বহুব্যবহৃত। ২২-পাপ অক্ষবিদ্যা।—এই পাশা খেলাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীজ; সেইজন্যই তিনি ইহাকে পাপ বলিতেছেন। ৩০ কাল কলিরূপে···বিপুলকুলে—কাল নলের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়াছিল। সেইরূপ শকুনিও এই বিপুল কুলে প্রবেশ করিয়া কুরুকুলপতি দুর্যোধনের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটাইয়া দিয়াছে।

৩৩—পুত্র-যোদ্ধা। ৩৪—প্রহরী—শব্দটি এখানে বিশেষ অর্থে

ব্যবহৃত হইয়াছে। (প্রহরা দের এই অর্থে নহে।) ৩৭—মেদিনী-সদনে-রমা—স্বর্গলোকে যেমন লক্ষ্মী সর্বগুণান্বিতা, মর্ত্তাধামে সেইরূপ দ্রৌপদী সর্বগুণান্বিতা লক্ষ্মীস্বরূপিনী। ৪২—অম্বুবিন্ব···দূর্বাদলে—তুঃ

নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কিরে ঝলমলে

কে না জানে অম্বুবিম্ব, অম্বুমুখে সদ্যঃ পাতি? (আত্মবিলাপ)

৪২-৪৩ নীরবৃন্দ··মুক্তাফল দেব—দূর্বার উপরে জলবিন্দু মুক্তার ন্যায় প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ তাহা মুক্তা নহে। সেইরূপ শকুনি-প্রদত্ত উপদেশ এবং পরিকল্পনা বাহ্যতঃ ফলপ্রদ, আশাপ্রদ ও মূল্যবান মনে হইলেও বস্তুত তাহা নহে, তাহা পরম অমঙ্গলকর।

৪৮—চিত্রসেন—দুর্যোধন যখন সপরিবারে প্রভাসতীর্থে যাইতে ছিলেন সেই সময় তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের উদ্যান ভঙ্গ করেন। তাহার ফলে চিত্রসেন ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে চিত্রসেন দুর্যোধনকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করেন।

৩৮—কে রাখিল আসি—সেই বিপদের সময় যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনকে সপরিবারে দুর্যোধনের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন এবং তাঁহারা গিয়া উহাদের উদ্ধার করেন।

৫০—৫২ বিপদে হেরিলে···তোমার বিপদে—শত্রু বিপদগ্রস্ত হইলে আনন্দের কারণ হয়। কিন্তু পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের শত্রু হওয়া সত্বেও দুর্যোধনের বিপদে ও লাঞ্ছনায় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন।

৫৮-৫৯—হে দয়া কি···কর গো বসতি—যাঁহারা দুঃখে-বিপদে এমন করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি যদি দয়া না হয়, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়ে দয়ার অধিষ্ঠান কেন?

৬০—কর্ণে তুমি কর্ণ দান কর—কর্ণ যুদ্ধের মন্ত্রণাদায়কের মধ্যে অন্যতম। তুমি তাঁহার কথা শ্রবণ কর কেন?

৬১—দেবতাকুলে জিনিল—খাণ্ডব দাহন কালে অর্জুন দেবতা দিগকে পরাজিত করেন। ৬২-৬৩ দলিল একাকী…মৎস্যদেশে—বিরাট দেশের গো-গৃহ হইতে কুরুসৈন্যগণ গোরু চুরি করিলে বিরাট রাজপুত্র উত্তর এবং অর্জুন ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কুরু সৈন্যগণকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। ৬৩—রাধেয়—সূতপত্নী রাধা কর্ণকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রাধেয় বলা হয়।

৬৪-৬৫ শৃগাল কি কভু ··সিংহেরে—তুঃ
মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? (মেঘনাদবধ কাব্য, ৬ষ্ঠ সর্গ)

৬৬—সূতপুত্র সখা তব? (অসম্ভবতা ব্যঞ্জক)। ৭০-১ স্নেহ প্রবাহিনী কিন্তু পাণ্ডবসাগরে—পিতামহ ভীষ্ম, রণগুরু দ্রোণাচার্য অবশ্য কৌরবকুলের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন—ইহারা অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। কিন্তু ইহাতে জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। কেননা, ইহারাও অন্তরে সত্যশীল পঞ্চপাণ্ডবকে গভীরভাবে স্নেহ করেন এবং সেক্ষেত্রে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ অসম্ভব। ৭৪—উত্তর গোগৃহরণে—বিরাট রাজপুত্র উত্তরের গো-গৃহ হইতে কুরুসৈন্যগণ যখন গোরু অপহরণ করিয়া লইয়া আসেন সেই সময় বৃহন্নলারূপী অর্জুনের সঙ্গে কৌরবের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন—ভীষ্ম ও দ্রোণকে পরাজিত করেন।

৭৬—জিষ্ণু—বিজয়ী। ৮০—কপিধ্বজ——অর্জুনের রথের পতাকায় হনুমানের মূর্তি অঙ্কিত থাকে বলিয়া ইহাকে কপিধ্বজ বলে। স্যন্দন—রথ।

৮২—ইরম্মদ—অগ্নি। মেঘনাদবধেও ইরম্মদ শব্দের ব্যবহার আছে। ৮৩—দেবঅস্ত্র—স্বর্গ হইতে অর্জুন যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

৮৪—দেবদত্ত ধ্বনি—অর্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত। সেই শঙ্খের ধ্বনি।

৮৫—গরজে বানর ধ্বজে—অর্জুনের রথচূড়ায় পবন নন্দন হনুমান বিদ্যমান থাকিয়া শত্রুর মনে ভয় উৎপাদন করিতেন। ৮৭—কিরীট—মুকুট। ৮৮—চন্দ্রচূড় ভালে—মহাদেবের কপালে।

৯৫—মদকল করী—মত্ততাজনিত কলধ্বনিকারী হস্তী। তুঃ মদকলকরী বিবিধ রতন অঙ্গে (প্রথম সর্গ, বীরাঙ্গনা।)

১০৩-৪—ব্যাঘ্রী বুঝি দিল দুগ্ধ দুষ্টে—ভীম এমনই নির্দয় যে তিনি যে মাতৃস্তন্য লালিত তাহা বিশ্বাস হয় না। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রী তাঁহাকে দুগ্ধ দান করিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহার প্রকৃতি ভীষণ। তুঃ

ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি। (মেঘনাদবধ, ৪র্থ সর্গ)

১১৯-২০—কে পারে খণ্ডাতে…এ ভব মণ্ডলে? তুঃ বিধির নির্বন্ধ কহ কে পারে খণ্ডাতে? (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।) ১২০—বাঁধজ পাঠভেদ ১ম ও ২য় সং নির্বন্ধ।

১২১—ঐ দেখ.. স্বপ্নে—ভবিষ্যৎকালের যুদ্ধচিত্র ভানুমতী স্বপ্নে দেখিয়াছেন। মেঘনাদবধেও ভবিষ্যৎ ঘটনার স্বপ্নদৃশ্য আছে। জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধকালে মূর্চ্ছিতা সীতা স্বপ্নে বসুন্ধরা কর্তৃক প্রদর্শিত ভবিষ্যৎ ঘটনার দৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

১২৪-১২৬—পড়িয়াছে গজরাজি…শত শত শব। তুঃ

পড়েছে কুঞ্জরগতি ভীষণ আকৃতি,
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে।
চূর্ণরথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি (মেঘনাদবধ কাব্য)

১৩০—কণ্ঠে শূক্তগুণ ধনু—অশ্বত্থামা হত শুনিয়া দ্রোণাচার্য যখন হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার ধনুর একপ্রান্ত কণ্ঠলগ্ন ছিল। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন শরদ্বারা সেই ধনুর গুণ কাটিয়া দিলে ছিন্নগুণ ধনু তাঁহার কণ্ঠ বিদ্ধ করিয়াছিল। ১৩১—আস্ফালিছে অসি… মস্তক ছেদিতে—শূক্তগুণ ধনু কণ্ঠে বিদ্ধ হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। তুঃ

কণ্ঠতলে বিন্ধি ধনু অস্থির হইল তনু
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ।
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন রথে পড়ি দেখি দ্রোণ
খড়্গ লয়্যা ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি তেন ধায় শীঘ্রগতি
উঠে গিয়া রথের উপর॥
কাটিল দ্রোণের শির ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর।
(দ্রোণ পর্ব—মহাভারত— কাশীরাম দাস)

১৩২-৩৩ আর এক ভূশয্যায়।—কর্ণ। তিনি ভূমির উপর দাঁড়াইয়া রথারূঢ় অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তুঃ

রথের উপরে তুমি অভাগ্যেতে আমি ভূমি (কাশীরাম)।

১৩৩-৩৪ রোষে মহী…ধরি রথচক্র—গুরুশাপে কর্ণের রথের চাকা বসিয়া যায়। তুঃ ব্যক্ত হয় ব্রহ্মশাপ কর্ণ পায় অনুতাপ
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র। (কাশীরাম দাস)

১৩৪—নাহি বক্ষে কবচ—অর্জুন বাণবিদ্ধ করিয়া কর্ণের কবচ কাটিয়া দেন। তুঃ অর্জুন যে সুসন্ধানে কবচ কাটেন বাণে
নিবারিতে নারে কর্ণবীর। (কাশীরাম)

১৩৫—আভাহীন ভানুদেব—তুঃ
সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ গগনে লোহিত বর্ণ (কাশীরাম)

আভাহীন···মহাশোকে যেন—কর্ণ সূর্যের পুত্র। তাই পুত্রের মৃত্যুতে পিতার কারুণ্যের ফলে সূর্য আভাহীন হইয়াছে।

১৩৬—অদূরে দেখিনু হ্রদ—দ্বৈপায়ণ হ্রদ। ভগ্ন-উরু দুর্যোধন এই হ্রদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

১৪১—পঞ্চখানি গ্রাম—পাণ্ডবেরা মাত্র পাঁচটি গ্রাম চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কৌরব পক্ষ বা দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচগ্র মেদিনী দিতে রাজী হন নাই।

অষ্টম সর্গ

১ কি যে…পোড়া কপালে—(বৈধব্য আশঙ্কার ছায়াপাত)

৪—সঞ্জয়ের মুখে—সঞ্জয় ব্যাসের প্রসাদে দিব্যচক্ষু পাইয়া প্রত্যক্ষবৎ যুদ্ধ বর্ণনা করিতেন। ৯—সুভদ্রানন্দনে—অভিমন্যুকে। ২৩—কাঁদিছেন পুত্র তব… দ্রোণগুরু পদে—অভিমন্যু যখন বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া কুরুপক্ষের সৈন্য ক্ষয় করিয়া চলিতেছিলেন তখন দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট কাতরোক্তি করিয়াছিলেন। ২৭—সপ্ত মহারথী—দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি। ৩০—৩১ কোন রথী রথচক্র কেহ—সপ্তরথীর মধ্যে কেহ অভিমন্যুর ধনু, কেহ রথচূড়া, কেহ বা রথচক্র কাটিয়া তাঁহাকে অস্ত্রহীন করিয়া পরিশেষে বধ করেন। তু:

স চ্ছিন্নধন্বা বিরথঃ স্বধর্ম্মমনুপালয়ন্।

খড়্গচর্ম্মধরঃ শ্রীমানুৎপপাত বিহায়সা ॥…

বিধনুঃ স্যন্দনাসিভৈর্বিচক্রশ্চারিভিঃ কৃতঃ।

অভিমন্যুর্গদাপাণিরশ্বত্থামানমাদ্রবৎ ॥

৩৭—পৌরব কুল ইন্দু—অভিমন্যু। ৩৯—অন্যায় সমরে—ব্যূহমুখ বন্ধ করিয়া সপ্তরথীতে মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে নিরস্ত্র করিয়া বধ করা অন্যায় সমর। ৪০—আর্জুনি—অর্জুনের পুত্র, অভিমন্যু। ৪৭—পূজ কুলদেবে…জামাতার হেতু—জয়দ্রথ ব্যূহমুখ অবরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডবপক্ষের কেহ অভিমন্যুর সাহায্যার্থ গমন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য অর্জুন জয়দ্রথের হত্যার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জামাতা জয়দ্রথের কল্যাণের জন্য কুলদেবতার পূজার কথা এখানে বলা হইয়াছে।

৪৯—৫০ গরজে…স্বর্ণরথচূড়ে—যুদ্ধকালে হনূমান সশরীরে অর্জুনের হনূমান-অঙ্কিত ধ্বজা সম্বলিত রথের উপর থাকিয়া ভীষণ গর্জন পূর্বক শত্রুর মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিত। মহাভারতের বনপর্বে ভীমের প্রতি হনূমানের উক্তি স্মরণীয়—'অর্জুনের কপিধ্বজে হৈব অধিষ্ঠান'। তুঃ কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে (৭ম সর্গ, বীরাঙ্গনা।)

৫২—৩—খেলিছে কিরীটে চপলা—ইন্দ্র অর্জুনকে এক চাকচিক্য-ময় মুকুট দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য অর্জুনকে কিরীটী বলা হইয়া থাকে। ৫৬—বামে—অর্জুনের উভয় হস্তই চলিত। এইজন্যই তাঁহাকে সব্যসাচী বলা হয়। ৬-৬৭ শুন, কহি ক্ষত্ররথী…এ ভব সংসারে। তুঃ

যস্মিন্নহতে পাপে সূর্যোঽস্তমুপযাস্যতি।
ইহৈব সংপ্রবেষ্টাস্মি জ্বলিতং জাতবেদসম্॥
অসুরসুরমনুষ্যাঃ পক্ষিণো বোরগা বা পিতৃরজনিচরা
বা ব্রহ্মদেবর্ষয়ো বা।
চরমচরমপীদং যৎ পরঞ্চাপি তস্মাত্তদপি মম
রিপুং তং রাক্ষতুং নৈব শক্তাঃ॥

(দ্রোণ পর্ব—ব্যাস)

৭৩—পূর্বকথা স্মরি—কাম্যক বনে যখন পাণ্ডবগণ অনুপস্থিত ছিলেন, সেই সময় জয়দ্রথ দ্রৌপদী হরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভীম তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। সেই পূর্বকথা স্মরণ করিয়া অর্জুন তোমার প্রতি দণ্ডবিধান করিতে চাহিতেছেন ?

৭৪-৭৫ কোথায় রোধিলে… ব্যূহমুখ তুমি—সঞ্জয়ের মুখে শুনিলেও ঘটনার মূল তাৎপর্য দুঃশলা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। মধুসূদন এই প্রচ্ছন্নতার কৌশল বহু পত্রিকাতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

৮৬—৯০—শুনিয়াছি আমি, ··শকুনি গৃধিনী পাল ! তুঃ

তব কথোদিনে হৈল দুর্যোধনে
মূর্ত্তিমন্ত যেন কলি
ভীম যেই দিন জন্মিল কাননে
সেই দিনে দুর্যোধন।
জনম মাত্রকে ঘোর শব্দে ডাকে
যেন গর্দ্দভ গর্জন।
তার ডাক শুনি যেন গৃধ্রধ্বনি
পেচক শৃগাল ডাকে।
কুকুর বিড়াল ডাকে পালে পাল
নগর পুরিল কাকে। (কাশীরাম)

৯১—বিদুর…ত্যজ এ নন্দনে। তুঃ

বিদুর বলেন অবধান মহারাজ।
যত অকুশল দেখি ভাল নহে কাজ॥
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজ নাহি আর কিছু।
তবে সে মঙ্গল ত্যজ এই শিশু॥ (কাশীরাম)

৯২—কুরুবংশ ধ্বংসরূপে আজি—তুঃ 'কুলের অন্তক রাজা এ পুত্র তোমার।'—কাশীরাম

৯৩—না শুনিলা পিতা —তুঃ

এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল॥

৯৭—পৌরব পঙ্কজ রবি—তুঃ লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে (মেঘনাদবধ কাব্য) 'পঙ্কজ-রবি' শব্দটি কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতেই মধুসূদন গ্রহণ করিয়াছিলেন—

'ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।'

৯৮—বীর্যাঙ্কুর—অতিমর্ত্ত্যা মূর্ত্তিমান বীর। কিন্তু বালক বলিয়া বীর্য্যের অঙ্কুর।

১১৪—কি ভেদ কে জন্ম হিমাদ্রিতে—হিমালয় পর্ব্বত হইতে যে দুইটি নদীর উৎপত্তি হয় তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সেইরূপ কুরু ও পাণ্ডু চন্দ্রবংশোদ্ভূত দুইটি শাখা। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়েই তাঁহাদের (দুঃশলা ও তাঁহার স্বামীর) সমান আত্মীয়। অতএব একজনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সঙ্গত নহে।

১১৮—কে আনিল…পাতিল, কহ—কুরু পক্ষই অক্ষক্রীড়ার জাল পাতিয়া পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়া বনে পাঠাইয়াছিল। তুঃ কুক্ষণে শিখিলা পাপ অক্ষবিদ্যা (৭ম সর্গ, বীরাঙ্গনা)

১২০—রজস্বলা—ঋতুমতী। ১৩১—কে আছে প্রহরী—প্রহরণধারী অর্থে। তুঃ দেব নর পূজ্য পার্থ অব্যর্থ প্রহরী (৭ম সর্গ, বীরাঙ্গনা।)

১৩৬—কি….গন্ধর্ব্বাধিপতি ? তুঃ

চিত্ররথ যবে,
কুরু বধূ দলে বাঁধি তব সহ রথে
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব।

১৩৮—কি করিলা উত্তর গোগৃহে—তুঃ উত্তর-গোগৃহ রণে জিনিল কিরীটী (৭ম সর্গ, বীরাঙ্গনা।) ১৪২—মণিভদ্রে ভুল না, নৃপমণি।—পুত্র অঞ্চলের ধন, মণি বলিয়া মণিভদ্র। ইহা কোন নাম নহে। জয়দ্রথ যখন যুদ্ধে নিহত হন তখন তাঁহার একটি শিশু পুত্র ছিল,তাহার নাম সুরথ। ১৪৭—১৫১—জানি আমি…সিন্ধু দেশপতি তুঃ

ন ভেত্তব্যং নরব্যাঘ্র! কো হি ত্বাং পুরুষর্ষভ!
মধ্যে ক্ষত্রিয়বীরাণাং তিষ্ঠন্তং প্রার্থয়েদ্‌যুধি ॥
অহং বৈকর্তনঃ কর্ণশ্চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
ভূরিশ্রবাঃ শলঃ শল্যো বৃষসেনো দুরাসদঃ॥
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যো দ্রোণো দ্রৌণিশ্চ সৌবলঃ।

১৬২—কপোত উড়ি নীড়ে—তুঃ

কপোতকপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে.. (মেঘনাবধ)



নবম সর্গ

১-৩ বৃথা তুমি···মিশে দিবানিশি—তুঃ

গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
নিরন্তর গঙ্গাগুণ স্মরে নৃপবর॥
গঙ্গার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে॥

(আদিপর্ব, মহাভারত, কাশীরাম)

৪-ভুল ভূতপূর্ব কথা—তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনকে ভুলিবার জন্য জাহ্নবী শান্তনুকে অনুরোধ জানাইতেছেন। শাপমুক্ত করিবার জন্য অষ্টবসুকে জাহ্নবী দেবী গর্ভে ধারণ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সাধিত হইবার পর তিনি স্বর্গলোকে চলিয়া যান। তিনি স্বর্গের দেবী, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে সম্পর্ক নাই। এই পত্রিকাতেই তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।'

৭-১৫ হর শির নিবাসিনী···তোমা সবাকারে। তুঃ

অহং গঙ্গা জহ্নুসুতা মহর্ষিগণসেবিতা।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমুষিতাহং ত্বয়া সহ॥
অষ্টৌ যে বসবো দেবা মহাভাগা মহৌজসঃ।
বশিষ্ঠশাপদোষেণ মানুষত্বমুপাগতাঃ॥
তেষাং জনয়িতা নান্যস্ত্বদৃতে ভুবি বিদ্যতে।
মদ্বিধা মানুষী ধাত্রী লোকে নাস্তীহ কাচন॥
তেষাঞ্চ জননীহেতোর্মানুষত্বমুপাগতা।
জনয়িত্বা বসূনষ্টৌ জিতা লোকাস্ত্বয়াক্ষয়াঃ॥

(ব্যাসমহাভারত, আদি, ৯২ অধ্যায়, ৫০-৫২

১০-১১ ঋষিশ্রেষ্ঠ·· বসুদলে—অষ্টবসুগণ বশিষ্ঠের কামদুঘা গাভী হরণ করায় তিনি অষ্টবসুকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ প্রদান করেন। তুঃ

তাস্মাৎ সর্বে জনিষ্যধ্বং মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥

এবং শশাপ ভগবান বসূংস্তান ভরতর্ষভ। (ব্যাস মহাভারত)

ধ্যান করি দেখে তবে বরুণ নন্দন।

আনিল হরিল গাভী বসু অষ্টজন ॥

ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল তৎক্ষণে।

নরযোনি জন্ম গিয়া লহ অষ্টজনে ॥ (কাশীরাম)

১২-১৫ যেদিন, পড়িল তোমা সবাকারে। তুঃ

মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।

স্তুতি করি আমারে মাগিল এইবর ॥

জন্মমাত্র আমা সবে ডুবাইবে জলে।

অঙ্গীকার কৈল আমি তা সবার বোলে ॥ (কাশীরাম)

১৬-বরিষু তোমারে সাধে—তুঃ

সে কারণে ভার্য্যা আমি হৈলাম তোমার।

এই ত কুমার রাজা বসু অবতার॥ (কাশীরাম)

১৮—**অষ্টশিশু** -পাঠভেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে **অষ্টপুত্র**।

অষ্টবসু—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভব। মতান্তরে অগ্নি, বসু, পৃথিবী. অন্তরীক্ষ, সূর্য, আকাশ, চন্দ্র ও নক্ষত্র।

১৯—সরোরুহ—পদ্মফুল। সরস্‌ + √রুহ + অ (ক)। ২৯—সপ্তজন গেছে স্বর্গধামে—তুঃ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত। একে একে গঙ্গাদেবী করিল নিপাত। ২৩ গ্রহ-গ্রহণ কর। ২৫—উজ্জ্বলিবে—উজ্জ্বল করিবে। ২৮-২৯ পালিয়াছি·· তব হেতু—তুঃ গৃহাণেমং মহারাজ। ময়া সংবর্দ্ধিতং সুতম্ (মহাভারত, আদি, ৯৬ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোকাংশ।) ৩৫-৩৯ বশিষ্ঠের শিষ্য···ডুবার সময়ে। তুঃ

বেদানধিজগে সাঙ্গান্ বশিষ্ঠাদেব বীর্যবান্।
কৃতাস্ত্রঃ পরমেষ্বাসো দেবরাজসমো যুধি ॥
সুরাণাং সম্মতো নিত্যমসুরাণাঞ্চ ভারত।
উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রময়ং তদ্বেদ সর্ব্বশঃ॥ ইত্যাদি।
এ পুত্রের গুণ রাজা না যায় কথনে।
অস্ত্রশিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে॥
দেবগুরু দৈত্যগুরু সম শাস্ত্র জ্ঞান।
অস্ত্র শিক্ষা জানে কৃষ্ণরামের সমান॥
সংসারে যতেক বিদ্যা যত নীতি ধর্ম।
এ পুত্রের অগোচর নহে কোন কর্ম।

৪১—সরসে—সরোবরে। সরসী প্রয়োগ শুদ্ধ।

৪৭-৪৮—কুলমান ধনে—বিশ্বগুণে। তুঃ

স দেবরাজসদৃশো ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাগৃজুঃ।
দানধর্ম্মতপোযোগাচ্ছ্রিয়া পরময়া যুতঃ॥
অরাগদ্বেষসংযুক্তঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।

৬১—করি ধৌত···কামগত মন :—একদা শান্তনুর সহিত তাঁহার যৌনজীবনের সম্পর্ক ছিল, সেই কামনালিপ্ত জীবনের তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করিতে চান। বিশেষ কারণে তিনি মর্ত্ত্য মানবীর রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কর্মান্তে তিনি পূর্ববৎ দেবী। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে শান্তনুর সম্পর্ক কামনার নহে, ভক্তির। মহাভারতেও জাহ্নবীর কামসম্ভোগের চিত্র আছে—সম্ভোগস্নেহচাতুর্ষ্যৈর্হাবলাস্যমনোহরৈঃ।

রাজানং রময়ামাস যথা রেমে তথৈব সঃ॥
(আদি, ৯২ অধ্যায়, ৪১ শ্লোক)

৬৮—পথে সঙ্গে···হস্তিনায়। তুঃ

ময়া দত্তং নিজং পুত্রং বীরং বীর! গৃহং নয়। (মহাভারত)

দশম সর্গ

৩—১০ লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম··· রাজা পুরুরবা প্রতি—ভূঃ দ্বিতীয়ঃ—লক্ষ্মীভূমিকায়াং বর্ত্তমানোর্বশী বারুণীভূমিকায়াং বর্ত্তমানয়া মেনকয়া পৃষ্টা। সখি সমাগতা এতে ত্রৈলোক্যসুপুরুষাঃ সকেশবাশ্চলোকপালাঃ। কতমস্মিংস্তে ভাবাভিনিবেশ ইতি।

প্রথম—ততস্ততঃ!

দ্বিতীয়ঃ—ততস্তয়া পুরুষোত্তম ইতি ভনিতব্যে পুরুরবসীতি নির্গতা বাণী। (বিক্রমোর্বশীয়ম্—কালিদাস)

৩—বারুণী—বরুণের পত্নী। ৪—অম্ভোজা—লক্ষ্মী। সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মী সমুদ্র-গর্ভ হইতে উঠিয়াছিলেন বলিয়া। ৭—কেশব—শ্রীকৃষ্ণ। ১০—হাসিলা—অভিনয় কালে ভুল আবৃত্তি হাস্যজনক। ১২—সরোষে ···দিলা মোরে—ভরত ছিলেন লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকের নাট্যাচার্য। তিনি উর্বশীর ভুল আবৃত্তি শুনিয়া রুষ্ট হইয়া স্বর্গচ্যুতির অভিশাপ দিয়াছিলেন।

৩০—শুভক্ষণে কেশী···হরিল আমারে—কেশী দৈত্য উর্বশীকে অপহরণ করিয়াছিল। ইহা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নহে। কিন্তু উর্বশীর নিকট শুভ হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ ঐ ঘটনা না ঘটিলে পুরুরবার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত না। সেইজন্যই শুভক্ষণ বলা হইয়াছে। ৩২—ভাবি সে সকল কথা—উর্বশী একদা সখী চিত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া কুবের ভবন হইতে স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ইন্দ্রের প্রতি শত্রুতাবশতঃ কেশী দৈত্য হেমকূট পর্বতে উহাদিগকে অপহরণ করে। এই সময় চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা সূর্যলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন। তিনি অপ্সরাগণের মুখে ঐ অপহরণ সংবাদ পাইয়া কেশীকে পরাজিত করিয়া উহাদেরকে উদ্ধার করেন। হেমকূট পর্বতে সকলে

মিলিত হইলে উর্বশী ও রাজা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়েন।

৩২—ছিন্ন পড়ি রথে—কেশী দৈত্যের রথে। ৩৪—গিরি—এখানে হেমকূটপর্বত।

৩৮-৩৯—প্রতিনাদ রূপে... সে ভীষণ স্বনে। তুঃ

এতেক কহিয়া, সখী, গর্জিলা সুরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে।

(মেঘনাদবধকাব্য—৪র্থ সর্গ)

৪৬—মনের আঁখি মীলিল হরষে—লজ্জা, সঙ্কোচ ও ভয়ে উর্বশী চর্মচক্ষু খুলিয়া পুরুরবাকে দেখিতে পারিল না বটে, কিন্তু মর্মচক্ষুতে তিনি তাঁহার রূপ সতৃষ্ণ নয়নে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ৪৭—কমলাকান্তে—পাঠভেদ। প্রথম সংস্করণে কমলকান্তে। 'কমলকান্তে' পাঠই যথার্থ ও সঙ্গত। ৫২-৫৬—দেখ নিরখিয়া এ বরাঙ্গ... আবার প্রসাদে, শুভে! তুঃ

আবির্ভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানেব রাত্রি
নৈর্শস্যার্চ্চিহুতভুজ ইব ছিন্নভূয়িষ্ঠ ধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা।
গঙ্গারোধঃ পতন কলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥

৫৩—রচ্যমান—পাঠভেদ। প্রথম সংস্করণে রুচ্যমান। রুচ্যমান পাঠই যথার্থ। ইহার অর্থ দীপ্তিমান, শোভমান। কোন কোন সংস্করণে 'রিচ্যমান' করা হইয়াছে। ইহা ঐ সংস্কৃত শ্লোকটির প্রভাব।

৫৯—৬১—হৃদয় কম্পে...পড়িলা যে শ্লোক কবি—তু:

মন্দার কুসুম দামা গুরুরস্যা সূচ্যতে হৃদয় কম্পঃ।
মুহুরুচ্ছ্বসতা মধ্যে পরিণাহবতোঃ পয়োধরয়োঃ॥

৬৮—বিক্রমাদিত্য—মহাতেজস্বী। ৭০—মলিন...ও সৌন্দর্য—মনোজ অর্থাৎ স্বয়ং কামদেব অনঙ্গ; যিনি রূপের জন্য প্রসিদ্ধ, তিনিও

তোমার রূপসৌন্দর্যের নিকট মলিন ও হীনপ্রভ। ৭৫-৭৬—রূপ-গুণাধীনা ··কি দিবে। ··—নারী পুরুষের রূপ ও গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ইহা স্বর্গলোকে ও মর্ত্যলোকের নারী সম্পর্কেই সত্য।

৮১—বিকাইব কায়মনঃ—তুঃ, কায়, মন, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে। (৫ম সর্গ, বীরাঙ্গনা।) ৮৩—উর্বীধামে—পৃথিবীতে। ৮৩—উর্বীশ—ক্ষিতীশ। ৮৬—বিষের ঔষধ বিষ—তুঃ।

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।

(উদ্ভট শ্লোক)

৮৭—অলি কাম বিষে— তু.

কামাতুরা আমি নাথ, তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কালে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি
যথা কৌমুদিনী কাঁপে কাঁপি থর থর।

(মধুসূদন—চতুর্দশপদী কবিতাবলী—উর্বশী)

৯৪—লিখিনু এ লিপি—'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকেও উর্বশীর ভূর্জ-পত্রে লিপি লিখনের কথা আছে। এই লিপি দ্বারা তিনি রাজার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছিলেন। অবশ্য সে পত্র শাপ প্রদানের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল।

৯৯—আমার—পাঠভেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে—আমার।

১০১—পত্রিকা বাহিকা—পাঠভেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে পত্রিকাবাহিনী।

১০৩—নিবেদনমিতি—এই ভাবে পত্র সমাপ্ত করিবার রীতি।

॥ একাদশ সর্গ ॥

[কাশীরাম দাস জৈমিনি মহাভারত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য জৈমিনি মহাভারতে মহিষীর নাম জ্বালা। লিপিকর প্রমাদে উহা জনায় রূপান্তরিত হইয়াছে।]

১—রাজতোরণে—প্রাসাদের পুরোভাগে। রণবাদ্য (সন্ধি ও মিত্রতাসূচক)। ৩—রাজকেতু—রাজপতাকা। ৪—রণমদে—যুদ্ধ উন্মাদনায়। ৫—সাজিছ কি নররাজ—(মূল ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বিস্ময়সৃষ্টি) ৬—প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে। 'মেঘনাদবধে' প্রতিবিধিৎসিতে ও প্রতিবিধানিতে উভয় শব্দেরই প্রয়োগ আছে। ৭—ফাল্গুনী-অর্জ্জুন। লোহে—রক্তে। ১১—টুট—খর্ব কর। কিরীটীর—অর্জুনের। ইন্দ্র অর্জুনকে কিরীটদান করিয়াছিলেন বলিয়া অর্জুন কিরীটী। ১—অন্যায় সময়ে বালকে—কুরুক্ষেত্র-বীর-শ্রেষ্ঠ অর্জুন বালক প্রবীরকে যুদ্ধে নিহত করে—ইহা অসম সমর বলিয়া অন্যায়। ১৬—জন্মে মৃত্যু· ·বিধি জগতে—তুঃ জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা ভবে চির স্থির কবে নীড় হায়রে জীবন-নদে। (জন্মভূমির প্রতি—মধুসূদন।) ১৮—সম্মুখ-সমরে—তুঃ সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি (মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম সর্গ) ২৪—পুত্রহা—পুত্রহন্তা ২৫—অতিথি-বরণে (ব্যাজোক্তি) ২৭—হত জ্ঞান···পুত্রের বিহনে—পুত্র প্রবীরকে হারাইয়া নীলধ্বজের নিশ্চয়ই জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। নতুবা তিনি পুত্রহন্তারক অর্জুনকে পরম আদরে আপ্যায়ন করিতেছেন কি বলিয়া? ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। ৩৫—

রাজ্য, হরি পুত্রধনে—পাঠভেদ। প্রথম সংস্করণে—হরি পুত্রধনে, রাজ্য। দ্বিতীয় সংস্করণে—রাজ্য, হরি পুত্রধনে। ৩৫—ক্ষত্রিয় ধর্ম এই কি নৃমণি?—পুত্রহন্তারকের সহিত মিত্রতা কি ক্ষাত্র ধর্মোচিত? ৪২-৩—নরনারায়ণ জানে ভক্তিভাবে। অর্জুন প্রবীরকে হত্যা করিলে নীলধ্বজের জামাতা অগ্নিদেব অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া বলেন—

আমার বচনে রাজা পরিহর রণ।

মনুষ্য না হয় পার্থ নর নারায়ণ। (কাশীরাম, মহাভারত)

৫৪—ভোজবালা—ভোজরাজের কন্যা। ৪৫—স্বৈরিণী—ব্যভিচারিণী। জারজ অর্জুনে—ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম বলিয়া তিনি জারজ সন্তান। ৫১—কুলটা যে নারী—কুন্তী। দুর্বাসার মন্ত্র জপ করিয়া তিনি ধর্ম, পবন এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে লাভ করিয়াছিলেন। কুমারী অবস্থাতে সূর্যের ঔরসে তাঁহার গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। এই জন্য তাঁহাকে কুলটা বলা হইয়াছে। ৫৬—দ্বৈপায়ন ঋষি—ব্যাসদেব। দ্বীপে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া দ্বৈপায়ন। সত্যবতীসুত—সত্যবতী (মৎস্যগন্ধা)র গর্ভে পরাশর মুনির ঔরসে ইঁহার জন্ম—ইনি মৎস্যগন্ধার কানীন পুত্র। ৫৭—ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ—মাতা ধীবরী মৎস্যগন্ধা এবং পিতা ব্রাহ্মণ পরাশর। ৫৮—কাম কেলিলয়ে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে—ব্যাসদেব বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা পত্নীতে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহা কামকেলির উৎকট নিদর্শন। ৫৯—ধর্মমতি—যিনি ভ্রাতার দুই বিধবা পত্নীতে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ধর্মমতি বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে। ৬২—পীতাম্বর—বিষ্ণু। ৬৪—শাশুড়ীর যোগ্য বধূ—পাণ্ডু মহিষী কুন্তী সূর্য, ধর্ম, পবন, এবং ইন্দ্রের ভজনা করিয়া চার পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পরে দ্রৌপদীও পঞ্চ স্বামীর ভজনা করিয়া পঞ্চ

পুত্র লাভ করিয়াছেন। সুতরাং যোগ্য শাশুড়ীর যোগ্য বধূ। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়।

৬৪ ৬৫—গৌরব সম্বন্ধে নলিনী—সরোবরের পদ্ম—অলি, রবি, সমীরণ সকলের প্রিয়া ও ভোগ্যা। সেইরূপ পাণ্ডব-কুল-সরোবরের পদ্ম দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়া এবং ভোগ্যা।

৭০—লোক মাতা…রমণী—এই কুলটা দ্রৌপদী কি ত্রিভুবন পূজিতা লক্ষ্মীদেবী হইতে পারেন ?

৭২—ছদ্মবেশে…ছলিল দুর্মতি—ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া একচক্রা নগরে পাণ্ডবেরা যখন বাস করিতেছিলেন—তখন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা হয় এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়াই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৭৪—ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে—ব্রাহ্মণ ভাবিয়াই রাজন্য-বর্গ অর্জুনকে নিহত করেন নাই বলিয়া জনার বিশ্বাস।

৭৬—দহিল খাণ্ডব… কৃষ্ণের সহায়ে—খাণ্ডবদাহনকালে তিনি দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহার কারণ ছলনাকারী কৃষ্ণ তাঁহার সহায় ছিল। নতুবা তিনি জয়লাভ করিতে পারিতেন না। ৭৯—সংহারিল মহাপাপী—স্ত্রীলোক সম্মুখে থাকিলে ভীষ্ম যুদ্ধ করিবেন না জানিয়া শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মহাতেজস্বী পিতামহ ভীষ্মকে হত্যা করা হইয়াছিল। এমন অন্যায় কার্য যে করিতে পারে তাঁহার পাপের সীমা নাই। ৮০—কি কুছলে…বধিল তাঁহারে—দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে এই মিথ্যা সংবাদ (ইহাও ছলনা ও প্রতারণা) শুনিয়া দ্রোণাচার্য হতচেতন হইয়া পড়েন। এই সময় ধনুকের গুণের একপ্রান্ত তাঁহার কণ্ঠলগ্ন ছিল। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন বাণ দ্বারা গুণ ছিন্ন করিলে, সেই গুণ দ্রোণের কণ্ঠে বিদ্ধ হইয়া তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন মুমূর্ষু আচার্যের শিরশ্ছেদ করেন। ৮২—ঘোর ব্রহ্মশাপে—অস্ত্রবিদ্যাকালে ভ্রমবশতঃ কর্ণের অস্ত্রে এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু

নিহত হয়। তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ কর্ণকে শাপ দেন যে মৃত্যুকালে ধরণী তাঁহার রথচক্র গ্রাস করিবে।

৮৫—মহারথী প্রথা কি হে এই—তুঃ—কহ মহারথী, এ কি মহারথী প্রথা? (মেঘনাদবধ কাব্য)

৮৬—আনায় মাঝারে—জালের মধ্যে।

৯৯—ভীরুতার সাধনা—ভীরুর প্রার্থনা ও আবেদন।

১১১—লিখিলা বিধাতা যাহা…তা কালে—তুঃ লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল এত দিনে।

১২০—কে মুছিবে তারে—জনার অন্তরের রিক্ততা লক্ষণীয়।

১২৫-২৬—যাও চলি … মিত্র পার্থ সহ—নীলধ্বজ শুধু যে যজ্ঞের অশ্ব প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; তিনি অশ্ব রক্ষা করিবার জন্য অর্জুনের সহিতও গমন করিয়াছিলেন। দ্রঃ

এত বলি নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে।
তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতি রঙ্গে॥

১২৮—মহাযাত্রা—যে যাত্রায় আর পুনরাগমন নাই; মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা।

১৩০—ছাড়িব এ … জাহ্নবীর জলে—পতির ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া ক্রোধে জনা মাহেশ্বরীপুরী ত্যাগ করিয়া ভ্রাতা উল্মুকের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অর্জুন হত্যার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু উল্মুক তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি ভাগীরথীর জলে প্রাণ ত্যাগ করেন। দ্রঃ

ভাগীরথী-তীরে জনা গেল শীঘ্রগতি।
জোড় হাত হয়ে বলে আপন ভারতী॥
শুন গঙ্গাদেবী আমি করি নিবেদন।
তোমার সলিলে আমি ত্যজিব জীবন॥
অর্জুন আমার পুত্রে বধিলেক প্রাণে।

সেই হৈতে চিত্তে হৈল বড় অভিমানে ॥
কাতর হইয়া স্বামী ভজিল অর্জ্জুনে ।
দুঃখ নিবারিতে কেহ নাহি তোমা বিনে ॥
অর্জুন নিধন হেতু আমি ত্যজি প্রাণ ।
আপনি করিবে মাতা ইহার বিধান ।
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল ।
পুত্রশোকে পায়্যা জনা শরীর ত্যজিল ।

(কাশীরাম : মহাভারত : অশ্বমেধ পর্ব)

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯ এর পক্ষ হইতে শ্রীবিমল কুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীরণজিত কুমার দত্ত কর্তৃক নবশক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত ৬৩-৮-১১০০।

পরিশিষ্ট

*প্রধান প্রধান গ্রন্থকারের কালানুক্রমিক গ্রন্থ তালিকা :—

অক্ষয়কুমার দত্ত।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১৮৫২-৫৩ ; চারু পাঠ, ৩ খণ্ড ১৮৫২, ১৮৫৪, ১৮৫৯ : ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় ১৮৭০, ১৮৮৩ ; ধর্ম্মনীতি ১৮৮৫।

অক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রদীপ ১৮৮৪ (১২৯২) ; কনকাঞ্জলি ১৮৮৫ (১২৯২) ; ভুল ১৮৮৭ (১২৯৪) ; শঙ্খ ১৯১০ (১৩১৭) ; এষা ১৯১২ (১৩১৯)।

অমৃতলাল বসু।

হীরক চূর্ণ ১৮৭৫ (১২৮২) ; তিল তর্পণ ১৮৮১ ; চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে (১৮৮৬) ; খাস দখল ১৯১১ (১৩১৮)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৭ ; শকুন্তলা ১৮৫৪ ; বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রস্তাব ১৮৫৫ ; সীতার বনবাস ১৮৬০।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা ১৮৬২

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ফুলশয্যা ১৮৯৪ ; আলিবাবা ১৮৯৭ ; ভীষ্ম ১৯১৩ ; কিন্নরী ১৯১৮ ; রত্নেশ্বরের মন্দিরে ১৯২২ ; নরনারায়ণ ১৯২৬।

* তালিকা সম্পূর্ণ নহে, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মায়াতরু ১৮৮১ ; বুদ্ধদেবচরিত ১৮৮৭ ; প্রফুল্ল ১৮৮৯ ; হারানিধি ১৮৯০ ; জনা ১৮৯৪ ; দেলদার ১৮৯৯ ; পাণ্ডব গৌরব ১৯০০ ; অশ্রুধারা ১৯০১ ; সিরাজদ্দৌলা, হরগৌরী ১৯০৫ ; মীরকাশেম ১৯০৬ ; ছত্রপতি শিবাজী ১৯০৭ ; অশোক ১৯১১।

চন্দ্রনাথ বসু।

শকুন্তলাতত্ত্ব ১৮৮১ (১২৮৮) ; ত্রিধারা ১৮৯১ (১২৯৭) ; সাবিত্রীতত্ত্ব ১৯০০।

দীনবন্ধু মিত্র।

নীলদর্পণ ১৮৬০ ; সধবার একাদশী ১৮৬৬ ; জামাই বারিক ১৮৭২ ; কমলে কামিনী ১৮৭৩।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মধর্ম ১৮৫২ ; ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ১৮৬১ ; আত্মজীবনী ১৮৯৮ ; (রচনা ১৮৯৫ ; মুদ্রণ ১৮৯৮)।

দেবেন্দ্রনাথ সেন।

ফুলবালা ১৮৮০ (১২৮৭) ; উর্মিলাকাব্য, নির্ঝরিণী ১৮৮১ ; অশোক-গুচ্ছ ১৯০০ (১৩০৮); হরিমঙ্গল ১৯০৫ (১৩১১); গোলাপগুচ্ছ ১৯১২।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

আর্যগাথা ১৮৮২ ; আষাঢ়ে ১৩০৫ ; হাসির গান ১৩০৭ ; নূরজাহান ১৯০৭ (১৩১৪) ; মেবার পতন ১৯০৮ (১৩১৫) ; চন্দ্রগুপ্ত ১৯১১ ; সাজাহান ১৯১২ (১৩১৯)।

নবীনচন্দ্র সেন।

অবকাশরঞ্জিনী ১৮৭১, ১৮৭৮; পলাশীর যুদ্ধ ১৮৭৫ ; রৈবতক ১৮৮৭ ; কুরুক্ষেত্র ১৮৯৩; প্রভাস ১৮৯৬।

প্যারীচাঁদ মিত্র।

আলালের ঘরের দুলাল ১৯৫৮।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নবীন সন্ন্যাসী ১৯১২ ; রত্নদীপ ১৮১৭ ; সিন্দুর কৌটা ১৯১৯।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫ ; কপালকুণ্ডলা ১৮৬৬; মৃণালিনী ১৮৬৯ ; ইন্দিরা, বিষবৃক্ষ ১৮৭৫ ; রাধারাণী, চন্দ্রশেখর, রজনী ১৮৭৫ ; বিজ্ঞান রহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর ১৮৭৫ ; কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৮ ; রাজসিংহ ১৮৭৭ ; সাম্য ১৮৭৯ ; আনন্দ মঠ ১৮৮৪ ; দেবী চৌধুরাণী ১৮৮৪ ; কৃষ্ণ চরিত্র, সীতারাম ১৮৮৬ ; বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ১৮৮৭ ; ধর্মতত্ত্ব ১৮৮৮ ; বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ১৮৯২।

বিহারীলাল চক্রবর্তী।

বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিণী, নিসর্গসন্দর্শন, বঙ্গসুন্দরী ১৮৭০ ; সারদামঙ্গল ১৮৭৯ ; সাধের আসন ১৮৮৯।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

পারিবারিক প্রবন্ধ ১৮৮২ (১২৮৮); সামাজিক প্রবন্ধ ১৮৯২ ; (১২৯৯) ; আচার প্রবন্ধ, বিবিধপ্রবন্ধ ১৮৯৪।

মধুসূদন দত্ত।

শর্মিষ্ঠা ১৮৫৯ ; পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ, ১৮৬০ ; তিলোত্তমাসম্ভব ১৮৬০ ; কৃষ্ণকুমারী, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য ১৮৬১ ; বীরাঙ্গনা কাব্য ১৮৬২ ; চতুর্দশপদী কবিতাবলী ১৮৬৬।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মরীচিকা ১৯২৩; মরুশিখা ১৯২৭; মরুমায়া ১৯৩০; সায়ম্ ১৯৪০; ত্রিযামা ১৯৪৮; নিশান্তিকা ১৯৫৭।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদ্মিনী উপাখ্যান ১৮৫৮; কর্মদেবী ১৮৬২; শূরসুন্দরী ১৮৬৮; কাঞ্চী কাবেরী ১৮৭৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

। কাব্য।

সন্ধ্যা সঙ্গীত ১৮৮২; প্রভাত সঙ্গীত ১৮৮৩; ছবি ও গান ১৮৮৪; কড়ি ও কোমল ১৮৮৬; মানসী ১৮৯০; সোনার তরী ১৮৯৩; চিত্রা, চৈতালি ১৮৯৬; কথা ও কাহিনী, কণিকা, কল্পনা ১৯০০; নৈবেদ্য ১৯০১; শিশু ১৯০৩; গীতাঞ্জলি, খেয়া ১৯১০; গীতিমাল্য ১৯১৪; বলাকা ১৯১৬; পলাতকা ১৯১৮; শিশু ভোলানাথ ১৯২২; পূরবী ১৯২৫; মহুয়া ১৯২৯; পুনশ্চ, পরিশেষ ১৯৩২; শেষ সপ্তক ১৯৩৫; পত্রপুট ১৯৩৬; শ্যামলী ১৯৩৭; প্রান্তিক, সেঁজুতি ১৯৩৮; আকাশ প্রদীপ ১৯৩৯; রোগশয্যায়, নবজাতক, সানাই ১৯৪০; আরোগ্য, জন্মদিনে ১৯৪১।

। নাটক।

বাল্মীকি প্রতিভা ১৮৮১; কালমৃগয়া ১৮৮২; প্রকৃতির প্রতিশোধ ১৮৮৪; রাজা ও রাণী ১৮৮৯; বিসর্জন ১৮৯০; মালিনী ১৮৯৬; শারদোৎসব ১৯০৮; প্রায়শ্চিত্ত ১৯০৯; রাজা ১৯১০; অচলায়তন, ডাকঘর ১৯১২; ফাল্গুনী ১৯১৬; গুরু ১৯১৮; অরূপ রতন ১৯২০; গৃহপ্রবেশ, মুক্তধারা ১৯২৫; শোধবোধ, রক্তকরবী, নটীর পূজা, চিরকুমার সভা ১৯২৬; কালের যাত্রা ১৯৩২; তাসের দেশ ১৯৩৩; চিত্রাঙ্গদা ১৯৩৬; চণ্ডালিকা ১৯৩৮; শ্যামা ১৯৩৯।

খ উপন্যাস।

বৌঠাকুরাণীর হাট ১৮৮২ ; রাজর্ষি ১৮৮৭ ; চোখের বালি ১৯০৩ ; নৌকাডুবি ১৯০৬ ; গোরা ১৯০৯ ; ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ ১৯১৬ ; যোগাযোগ ১৯২৯ ; শেষের কবিতা ১৯২৯ , দুই বোন ১৯৩৩ ; মালঞ্চ, চার অধ্যায় ১৯৩৪।

গ প্রবন্ধ।

পঞ্চভূত ১৮৯৭ , চরিত্রপূজা, প্রাচীন সাহিত্য, লোক-সাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য ১৯০৭ ; সমাজ, শিক্ষা ১৯০৮ ; সঞ্চয় ১৯১৬ ; ভারতপথিক রামমোহন রায় ১৯৩৩ , সাহিত্যের পথে ১৯৩৬ ; কালান্তর ১৯৩৭।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গ বিজেতা ১৮৭৪ ; মাধবী কঙ্কণ ১৮৭৭ , মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ১৮৭৮; রাজপুত জীবন সন্ধ্যা ১৮৭৯ ; সংসার ১৮৮৬, সমাজ ১৮৯৩।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

নানা প্রবন্ধ ১৮৮৫।

রাজনারায়ণ বসু

সেকাল ও একাল ১৮৭৪ , আত্ম-চরিত

রামমোহন রায়।

বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫ ; বেদান্ত সার, গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১৮৩৩।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বড়দিদি ১৯১৩ ; বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, পরিণীতা ১৯১৪ ; অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ ১৯১৬ ; পণ্ডিতমশাই ১৯১৭ ; শ্রীকান্ত ১ম, দেবদাস, চরিত্রহীন ১৯১৭ ; শ্রীকান্ত ২য় ১৯১৮ ; গৃহদাহ ১৯২০ ;

দেনাপাওনা ১৯২৩; দত্তা ১৯২৪; পথের দাবী ১৯২৬; শ্রীকান্ত ৩য় ১৯২৭; শেষ প্রশ্ন ১৯৩১; শ্রীকান্ত ৪র্থ ১৯৩৩।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পালামৌ ১৮৮০।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি, বেনের মেয়ে ১৯১৯।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিন্তা-তরঙ্গিনী ১৮৬১; বীরবাহু কাব্য ১৮৬৪, কবিতাবলী ১৮৭০; বৃত্র সংহার ১৮৭৫, আশা ১৮৭৬; দশমহাবিদ্যা ১৮৮২, 'রোমিও জুলিয়েট' ১৮৯৫, চিত্ত বিকাশ ১৮৯৮।

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ ১৮···ধ্রুবতপস্যা—লেখক ভিন্ন গিরিশচন্দ্র ঘোষ [সুকুমার সেন-কৃত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য]

পৃঃ ৪৯···শশিভূষণ দাসগুপ্ত